
তরুণের প্রণবানন্দ
স্বামী বেদানন্দ

তরুণের প্রণবানন্দ

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলকাতা-১৯

নিবেদন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নাম দেশের অনেকেই শুনেছে, অনেকেই জানে। সঙ্ঘের বহুবিধ সেবাকার্য্যের কথা অনেকেই সংবাদপত্রে পড়ে থাকে। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে সঙ্ঘের আশ্রমে অনেকেই আশ্রয় পেয়ে আসছেন।

কিন্তু এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই সঙ্ঘের বহুমুখী কর্মধারা কে প্রবর্ত্তন করেছেন? কার শক্তি ও নির্দ্দেশিত পথে এই সঙ্ঘ চলেছে? এ সব সংবাদ খুব কম লোকেরই জানা।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ আশ্বাস দিয়েছেন—"ভারত আর দীর্ঘকাল প্রসুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিবে না। ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার জগদ্‌গুরুর আসনে উপবেশন করিবে।"

কিন্তু জগতের গুরুরূপে ভারতীয় জাতিকে গড়তে হলে কী চাই? প্রণবানন্দ বলতেন—বালক ও যুবকগণই জাতির ভবিষৎ আশা-ভরসা, দেশের যথার্থ সম্পদ। বালক ও যুবকগণ যদি মানুষের মত মানুষ হয়, তবেই জাতি হবে—জ্ঞানে, গুণে পৌরুষে, বীর্য্যে উন্নত ও গরীয়ান।"

তাই তরুণ সমাজ ছিল আচার্য্য প্রণবানন্দের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তাঁর প্রাণে সতত এই ভাবনা ও ব্যথা জাগ্রত ছিল—"যারা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, সেই বালক, কিশোর ও যুবকদের জন্য কেউ ভাবে না, তাদের প্রাণের ব্যথা-বেদনা কেউ বোঝে না, প্রতিকার তো দূরের কথা। তারা যে শক্তি সামর্থ্য উদ্যম উৎসাহ মনুষ্যত্ব হারিয়ে বুকচাপা তুষানলে পুড়ে মরছে, নেতা অভিভাবক শিক্ষক—কেউ তা খোঁজ করে না।"

অসহায় তরুণ সমাজের জন্য আচার্য্য প্রণবানন্দ সারা জীবন কেঁদে গেছেন। তাদের কল্যাণের জন্য, তাদের জীবন গঠনে সহায়তা দানের জন্য, তিনি তাঁর জীবনের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করেছেন।

দেশের তরুণ সমাজের বিপদ ও ব্যথা যে তিনি শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব

করেছেন, তা নয়। তিনি দেশের শত সহস্র লক্ষ স্কুল কলেজের ছাত্র, কিশোর যুবকগণের জন্য দিবারাত্র অবিরাম পরিশ্রম করে গেছেন—শত প্রকার উপায়ে।

যখন স্কুলের ছাত্র, নাম বিনোদ, তখন তিনি তাঁর প্রধান শিক্ষককে বলতেন— "মাষ্টার মশায়, ছেলেদের দুরবস্থা আর চোখে দেখা যায় না, আমি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাব, সন্ন্যাসী হব, নইলে এদের রক্ষার কোন উপায় করতে পারব না।"

আবাল্য আজীবন দেশের তরুণগণের এমন দরদী মরমী ব্যথার ব্যথী আর কে ছিল, বা আছে? দেশের এই তরুণদের সামনে তাদের পরিত্রাতা আচার্য্যের জীবন পরিচয় সংক্ষেপে ধরে দিবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কেন?

স্বামী প্রণবানন্দ ছিলেন—আচার্য্য। আচার্য্য কে? যিনি স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দেন। জীবন ও চরিত্র গঠন, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের জন্য মনুষ্যত্বের ও মহত্ত্বের উদ্বোধনের জন্য প্রাত্যহিক জীবনে যে ভাবে যে নিয়মে চলা উচিত, প্রণবানন্দ নিজের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে তেমনি নিখুঁত ভাবে আচরণ করেছেন। তাঁর জীবনালোক তরুণ সমাজকে আঁধার জীবনে পথ দেখাবে—নিঃসন্দেহ।

—গ্রন্থকার

তরুণের প্রণবানন্দ

প্রথম অধ্যায়

॥ এক ॥

"**ছেলেটি কে?**"

বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে জিজ্ঞাসা করলেন বাজিতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবাগত প্রধানত শিক্ষক **বীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য**।

"**ও বিনোদ**, স্যার"—উত্তরে একজন শিক্ষক সানন্দে বললেন।

"যেমন সুন্দর বিশাল বলিষ্ঠ ওর শরীর তেমনি মধুর পবিত্র ওর স্বভাব চরিত্র"—সোৎসাহে জানালেন আর একজন শিক্ষক।

"ও বড় ধীর, স্থির, শান্ত, বিনয়ী ছেলে। স্কুলের বার্ষিক সচ্চরিত্রতার পুরস্কারটি ওর একচেটে"—অন্য শিক্ষক বুঝিয়ে বললেন।

আর একজন শিক্ষক বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে প্রশংসা করলেন—বিনোদ খুব পরোপকারী বিপদে আপদে রোগে শোকে ও বুক দিয়ে সকলের সেবা সাহায্য শান্তি দান করে।"

বীরেন্দ্রবাবু দেখলেন—সহকারী শিক্ষকগণ সকলেই বিনোদের গুণগানে কলকণ্ঠ। সকলেই বিনোদকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে।

তারপর জিজ্ঞাসিত হয়ে শিক্ষকগণ অসাধারণ বালকটির নানা প্রকার গুণের আলোচনা করতে লাগলেন।

"স্যার! ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, কৌপীন পরে, খালি তক্তায় শোয়, এক ঘন্টার বেশী ঘুমোয় না।"

"রীতিমত ব্যায়াম করে—ডন বৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে, শরীরে অসম্ভব শক্তি রাখে। দড়ি টানাটানি খেলায় ও যে পক্ষে যাবে সে পক্ষ জয়ী হবেই। খুঁটি হয়ে দাঁড়ালে, কার সাধ্য ওকে নাড়ায়।"

"খায় কিন্তু শুধু ভাত। ঘি না, দুধ না, মাছ মাংস তো নয়ই, স্রেফ নুন ভাত। বড় জোর তার সঙ্গে কয়েকটা সিদ্ধ করা আলু।"

"বিনোদ ছেলেদের দলপতি। সাপুড়ের বাঁশীতে সাপ যেমন পোষ মানে, ছেলেরা তেমনি ওর বশীভূত। একদল ছাত্র তো ওর কথায় ওঠে বসে। ও যা বলে তাই শোনে; যা যা করে, তাই করতে চেষ্টা করে।"

"ও কিন্তু কথা বলে খুব কম, তাও খুব আস্তে আস্তে। যার সাথে কথা কয় সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনতে পায় না।"

গুণমুগ্ধ শিক্ষকগণের মুখে একের পর এক বিনোদের গুণের আলোচনা শুনতে শুনতে প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্র বাবুর বিস্ময় বেড়ে যায়। আর সাথে সাথে ছেলেটির প্রতি স্নেহাকর্ষণও বেড়ে ওঠে ততোধিক।

স্কুল ও কলেজে নিজে তিনি শত সহস্র ছাত্রের সাথে পড়েছেন। অসংখ্য বালক ও যুবকের সংস্রবে এসেছেন। বাজিতপুর স্কুলেও তো বহু শত ছাত্র দেখেছেন; কিন্তু বিনোদের মত তো একটিও চোখে পড়েনি, পড়ে না! এমন ভাবে সকল শিক্ষক সমস্বরে কোন ছেলের প্রশংসা করেন না। নির্ব্বাক্ হয়ে তিনি শুধু ভাবেন, আর বলেন—"আশ্চর্য্য!"

বীরেন্দ্রবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক, ধর্ম্মভাবপ্রবণ; দীক্ষা নিয়েছেন গোরক্ষপুর মঠের প্রসিদ্ধ যোগিরাজ বাবা গম্ভীরনাথের নিকট থেকে। এ হেন শিক্ষক বীরেন্দ্রবাবুর বিস্ময় চরমে উঠল, যখন একজন শিক্ষক তাঁকে শুনালেন—

"ছেলেটির কিন্তু পড়াশুনায় মন নেই। সদাই কেমন একটা উদাস উন্মনা ভাব। কী মনে ভাবে, কীসের ধ্যানে সর্বদা আনমনা হয়ে থাকে। ক্লাসে পড়া হচ্ছে, সে কিন্তু কোণের বেঞ্চিতে বসে আপন ভাবে ডুবে আছে। ছুটি হয়ে গেল, ছাত্ররা সব বাড়ী চলে গেল, তখনো তার হুঁস্ নেই। বসেই আছে। হুঁস্ যখন এল, তখনই বই খাতাপত্র বগলদাবা করে বাড়ী চলল।"

"বাড়ীতেও এমনি, নিজের ছোট্ট কুটীরখানির মধ্যে বসে আছে, আলো জ্বলছে, বই খোলা রয়েছে সামনে! সে কিন্তু কীসের ভাবনায় বিভোর। রাত কেটে

গেছে, ভোর হ'য়ে গেছে, জানতেও পারেনি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ ডাকল, তবে হুঁস হল।"

বালক বিনোদের এই অলৌকিক গুণাবলী শুনতে শুনতে বীরেন্দ্রবাবুর শরীর হল রোমাঞ্চিত, অন্তর পুলকিত, হৃদয় আনন্দে আপ্লুত।

অধীর চিত্তে গেল সেদিন। পরদিন বিনোদকে একা ডেকে এনে আলাপ করলেন। বীরেন্দ্রবাবু দেখলেন এ শিশু সিংহশিশু, এ বালক দেববালক, একটি আধফোটা সহস্রদল কমল, দেবশক্তির একটা ফুটন্ত অগ্নিগর্ভ আগ্নেয় গিরি। ক্রমে ক্রমে বালক বিনোদ এবং যুবক প্রধান শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল।

ক্রমে এমন হল যে বিনোদকে না পেলে বীরেন্দ্রবাবুর ভজনকীর্ত্তন-উপাসনা জমে না। বর্ষাকাল, মাঠে জল থৈ থৈ করছে। রাস্তাঘাট জলের তলে। এমন অবস্থায়ও নৌকা পাঠিয়ে বিনোদকে নিজের বাসায় আনা চাই। বিনোদ সতেরো বছরের বালক, কোন কথা কয় না গান-কীর্ত্তনে যোগ দেয় না, চুপটি করে বসে থাকে, স্থির অবিচল প্রস্তরমূর্ত্তি! তবু সে উপস্থিত না থাকলে বীরেন্দ্রবাবুর উপাসনা চলে না, অদ্ভুত ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের আশ্চর্য্য আকর্ষণ!

সে-বার শিবরাত্রিতে পূজা উৎসবের আয়োজন করলেন বীরেন্দ্রবাবু নিজের বাসভবনে। সঙ্গিগণ সহ তিনি চার প্রহরে চারবার পূজা করলেন, সারারাত ভজন কীর্ত্তনের মাতামাতি চলল। কিশোর বিনোদ একপাশে সমস্তটা রাত একটানা ধ্যানাসনে বসে রইল—অটল, অনড়, যেন প্রকাণ্ড পাথরের শিব—মহাধ্যানে মগ্ন, মহাযোগী মহেশ্বর। বীরেন্দ্রবাবু ও তাঁর সঙ্গিগণ বিস্ময়ে অবাক্—কী অলৌকিক শক্তিধর বালক, কীরূপ অতলস্পর্শ তার ধ্যানপ্রতিভা!

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত বালকটি কে? ইনিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

বীজের মধ্যে থাকে বৃক্ষটি অতি সূক্ষ্ম আকারে ; কুঁড়ির মধ্যে থাকে ক্ষুদ্র আকারে শতদলটি। শিশুর মধ্যেই থাকে পরিপূর্ণ মানুষটি। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ফুটে ওঠে সেই মনুষ্যত্ব। বালক বিনোদের মধ্যে যে মহত্ত্বের, দেবত্বের ও অসাধারণ শক্তির আভাস পাওয়া যেত, তাতেই শিক্ষক মহাশয়রা বুঝে

নিয়েছিলেন যে এ বালক ভবিষ্যতে মহাশক্তিধর মহাপুরুষ হয়ে দাঁড়াবে।

এই বালকের জন্ম ইতিহাসও অদ্ভুত। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করব।

॥ দুই ॥

"**বিষ্ণুচরণ!** ফরিদপুরে যে কয়দিন থাকবে, আমার বাসায় খাবে কিন্তু"—আদর ও আত্মীয়তার সুরে আদেশ জানালেন **রাজকুমার মজুমদার**।

মামলা উপলক্ষ্যে এসেছেন ফরিদপুর জেলা সহরে রাজকুমার মজুমদার ও বিষ্ণুচরণ দাস। দুজনে একই গ্রামের অধিবাসী। রাজকুমার প্রতাপশালী জমিদার, ব্রাহ্মণ। আর বিষ্ণুচরণ তাঁরই সেরেস্তার কর্ম্মচারী, কায়স্থ। উভয় পরিবারের মধ্যে সামাজিক বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালের। বিষয় সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমায় কিন্তু পরস্পর বাদী-প্রতিবাদী। মামলা চলছেও বহু বৎসর ধরে। তাতে কিন্তু তাঁদের সামাজিক বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতা বিন্দুমাত্রও নষ্ঠ করতে পারেনি। তাই মামলা মোকদ্দমা করতে সহরে এসেও দু'জনে একসঙ্গে বসে না খেলে তৃপ্তি হয় না।

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমার মধ্যে **বাজিতপুর** একখানি গ্রাম। **কুমার নদ** থেকে একটি খাল বেরিয়ে এঁকে বেঁকে প্রবেশ করেছে এই গ্রামে। শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে তা শোভা পাচ্ছে গ্রামটির বুকে একগাছি 'সাতনরী' হারের মত। চারদিকে দিগন্তব্যাপী শস্যশ্যামল ক্ষেত্র; সবুজ পল্লবঘন বৃক্ষরাশির শ্যামশোভায় পল্লীখানি ছায়াশীতল।

এই গ্রামেরই জমিদার রাজকুমার মজুমদার, তখনকার মৈমনসিং-এর **মহারাজা সূর্যকান্তের** জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর এই গ্রামেরই বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ বিষ্ণুচরণ দাস বা বিষ্ণু ভুঁইয়া।

বিষ্ণু ভুঁইয়ার দেহখানি যেমন বিশাল ও বলিষ্ঠ, হৃদয়খানি ছিল তেমনি উদার, আর মনটিও ছিল ব্রজের মত দৃঢ়। স্বভাবে ছিল তাঁর অটুট গাম্ভীর্য্য, আর সঙ্কল্পে ছিল তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা। বিষ্ণু ভুঁইয়ার অদম্য পৌরুষের কাছে সকলের মাথা নত হত সম্ভ্রমে, ভয়েও। তেজস্বী জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্ভীক ভাবে তিনি মামলা চালালেন একাদিক্রমে বিশটি বছর। তিনি যে সাহস ও মনোবলের পরিচয়

দিলেন তাতে গ্রামবাসিগণ বিস্মিত চমকিত হয়ে বলতো—"বিষ্ণু ভুঁইয়া মা কালীর বর পেয়েছেন।"

"মা ভৈঃ! বৎস। আমি শীঘ্রই তোমার ঘরে আসছি তোমার পুত্ররূপে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তোমার"—ভক্ত বিষ্ণুচরণকে বর দিয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব।

বাইরে থেকে দেখতে বিষ্ণু-ভুঁইয়ার স্বভাব ছিল—রাজসিক। কিন্তু অন্তরে তাঁর ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তাঁর হৃদয়ও ছিল উদার, পরদুঃখকাতর; সে খবর খুব কম লোকই রাখতো। আখ শক্ত, কিন্তু চিবোলে তা থেকে মিষ্ট রস পাওয়া যায়। বিষ্ণুচরণেরও কঠোর বাহ্য প্রকৃতি আড়ালে ছিল অমনিতর একখানি কোমল করুণাঘন হৃদয়।

মামলার জালে জড়িত বিষ্ণু ভুঁইয়ার অন্তর শরণাগতি ও ভক্তিভাবে বিগলিত হল। গৃহদেবতা নীলরুদ্রের শরণ নিলেন তিনি। একটি বছর ধরে সমস্ত রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দেবাদিদেবের আরাধনা করলেন। তাঁর সাধ্বী পত্নী ছাড়া এ সংবাদ কেউ জানতো না।

স্বীয় বিপদ উপলক্ষ্যে বিষ্ণুচরণের বিশাল হৃদয়ে ব্যথিত নিপীড়িত জনগণের বেদনার অনুভূতি উথলে উঠল। সে ব্যথার অশ্রুজল ঝরে পড়তে লাগল। অনাথের নাথ ব্যথাহারী বরাভয়দাতা আশুতোষ শিবের শ্রীপাদপদ্মে। ধ্যান ভাঙল ধূর্জটির, ভক্তের কাতর ডাকে আসন টলল শিবের। তিনি দর্শন ও বর দিলেন। চমকিত পুলকিত বিষ্ণুচরণ। উক্ত বরদান-কাহিনী এরূপ—

"আমি তোমার পুত্ররূপে আসছি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তোমার"—শুনালেন স্বীয় ধর্মপত্নী পুণ্যবতী **সারদা দেবীকে**. সারদা দেবীও সানন্দে স্বামীকে জানালেন আর এক আশ্চর্য কাহিনী ঃ

"আমিও এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি—স্বপ্ন তো নয়, খোলা চোখে দেখলাম, হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম, বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম,—ভোলানাথ শিব শিশুরূপে আমার কোল আলো করে শুয়ে আছেন।" আনন্দে ভুঁইয়া দম্পতির হৃদয়-মন কানায় কানায় পূর্ণ হল। মহাদেবের বরাভয় পেয়ে নির্ভয় হলেন তাঁরা।

তারপর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমার পবিত্র গোধূলি লগ্নে সারদা দেবীর কোল আলো করে এল এক অপরূপ শিশু। তখন ভক্তকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে গ্রাম মুখরিত; নির্মল নির্মেঘ গগনে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত। এমনি শুভ সময়ে মহা ভাগ্যবতী **সারদা দেবী** লাভ করলেন এক পরম সুন্দর শিশু-অতিথি, শিবের বরে শিশুরূপে স্বয়ং শিব। উল্লসিত নারীকণ্ঠে উঠল ঝাঁকে ঝাঁকে হুলুধ্বনি। মঙ্গল শঙ্খনাদে উদ্‌ঘোষিত হল শিশু-দেবতার আগমনী।

মহা আনন্দে ভুঁইয়া শিশুর নাম রাখলেন **"জয়নাথ।"** কারণ শিশুর আবির্ভাবের শুভক্ষণ থেকে ভুঁইয়ার বিপদের জাল মাকড়সার জালের মত সহজে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। লক্ষ্মীর শুভ-দৃষ্টিতে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে লাগল বিষ্ণুচরণের ঘর-সংসার। শিশুর জন্মদিন ছিল বুধবার। তাই বাড়ীতে অভিভাবকেরা ডাকতেন **"বুধো"** নামে। অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হল **"বিনোদ"**। এই নামেই ছিল তাঁর পরিচয় সর্বসাধারণের কাছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত।

শিবের বরে আবির্ভূত বালক বিনোদের জীবনে ও চরিত্রে যে আশৈশব শিশুভাবই বিকশিত ছিল, তা আমরা শিক্ষকদের গুণব্যাখ্যার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। পরে ক্রমে তা আলোচিত হবে।

॥ তিন ॥

"ও বুড়ি, বুধো কোথায় রে? তাকে তো দেখছিনে, দ্যাখ দিকি কোথায় গেল?"

জননী সারদা দেবী উৎকণ্ঠিতা হয়ে কনিষ্ঠা কন্যা **হেমাঙ্গিনীকে** জিজ্ঞাসা করলেন। হেমাঙ্গিনী বিনোদের দিদি। বিনোদকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। শুধু শৈশবে ও কৈশোরে নয়, উত্তরকালে বিনোদ যখন সঙঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ নামে সর্বত্র বিখ্যাত হলেন, তখনো স্নেহময়ী ভগিনী হেমাঙ্গিনী আদরের ভ্রাতাটির সেবায় সদা উদ্যত থাকতেন।

মায়ের নির্দেশে বুড়ি ছুটল, গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে এদিকে ওদিকে বিনোদের

খোঁজে; খানিক পরে দেখে যে বিনোদ চোখ বুজে এক গাছের তলায় নিশ্চল হয়ে বসে আছে। জন্মাবধি শিশু বিনোদের এমনিতর ভাব—স্থির, শান্ত, আপন ভাবে নিমগ্ন। শিশুকে প্রায়ই এমনিভাবে এখানে সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। শিবের বরে জন্ম, বিনোদের শিব-স্বভাব।

শঙ্কিতা বুড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে মায়ের কাছে এনে দিয়ে অনুযোগের সুরে বলল ঃ "এই নাও, কি অদ্ভুত ছেলে তোমার! এমন তো দেখিনি কোথাও! খাওয়া দাওয়ার হুঁস নেই, খেলাধূলোর নাম নেই। দিনরাত সারাক্ষণ কেবল চুপচাপ বসে থাকা! এটা কি একটা জড় ভরত হবে নাকি?"

শিবের বরে শিবই স্বয়ং শিশুরূপে এসেছেন—এ খবর পিতামাতা ছাড়া কেউ জানত না। কাজেই বিনোদের এমনতর আপন-ভোলা ভাব দেখে শুধু বাড়ী নয়, আত্মীয় পরিজন অনেকেই ভাবত—ছেলেটি হাবা। তথাপি শিশুটির প্রতি সকলেরই আকর্ষণ। শিশুর সুন্দর, সুঠাম সুমধুর দেহসৌষ্ঠব যেমন সকলের মনোহারী ছিল, তেমনি তার শান্ত সদানন্দ আপনভোলা স্বভাবটিও সকলেরই প্রাণে প্রীতি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগাত।

"অত চেঁচামেচি কীসের রে! কী হয়েছে?" একদিন জননী সারদা দেবী গোলমাল শুনে অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে বুড়িকে জিজ্ঞসা করলেন। বুড়ি এসে খবর দিল যে বিনোদ ছাদের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অমনি ব্যস্ত-সমস্ত ছুটে গেলেন স্নেহময়ী জননী, বিনোদকে কোলে নিয়ে নীচে এলেন। সুস্থ হলে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছিল রে বুধো! অমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলি কেন?

বালক বলল, "ছাদ থেকে থুথু ফেলে ছিলাম, উঠোনে তুলসী গাছের উপর "থুথু" পড়েছিল, অমনি এক দেবতা বেরিয়ে এসে আমার মধ্যে মিশে গেলেন। কখন আমি পড়ে গেছি, তা জানিনে।" আশ্চর্য্য এই যে বিনোদ বয়সে ছোট হলেও তার বুদ্ধি বিচার ছিল প্রবীণ ব্যক্তির মত। জননী সারদা দেবী গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসী পিঁড়িটিকে রোজ সযত্নে লেপন করেন। সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বেলে দেন, গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। শিশু বিনোদ

দেখে আর ভাবে—"ছোট্ট একটা তুলসী গাছ, তার উপর এত স্নেহ মমতা, এত সেবা-যত্ন কেন? এর মধ্যে আছে কী?

সেদিন তুলসী বৃক্ষে দেবতা দর্শনে বিনোদের সংশয় দূর হ'ল। বালক বুঝল যে তুলসী গাছে যথার্থই দেবতার অধিষ্ঠান।

পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। একদিন মাদারিপুর আশ্রমের প্রবেশমুখে বেঞ্চির উপর আচার্য্যদেব (বিনোদ) উপবিষ্ট; পাশে দাঁড়িয়ে স্বামী বেদানন্দ। স্বামীজীর অলক্ষ্যে তাঁর কাপড়ের একপ্রান্ত পড়েছিল পার্শ্ববর্তী একটি তুলসী গাছের উপর। সেদিকে আচার্য্যের চোখ পড়তেই তিনি স্বামীজীকে কঠোর স্বরে ধমক দিয়ে বললেন—

"সরে দাঁড়াও! তোমার কাপড় পড়েছে তুলসী গাছের উপর। তুলসী জাগ্রত দেবতা। পাঁচ মিনিট একমনে তাকিয়ে থাকলে কথা বলে"।

"এ তো মাটির পুতুল! এতটা ঘটা করে এর পূজা করা কেন? আবার তিনদিন পরে জলে ডুবিয়ে দেওয়াই বা কেন? মা দুর্গা কি সত্যই এর মধ্যে থাকেন? সত্যিই কি মা দুর্গা সন্তানগণের পূজা নেন, নৈবিদ্যি খান? না, এসব শুধু ছেলেখেলা, আমোদ প্রমোদ, রং তামাসা?"

ভাবে বিনোদ। বিনোদ তখন কৈশোরে পা দিয়েছে।

ভূঁইয়া বাড়ীর নিকটেই কবিরাজ **হরবিলাস দাসের** বাড়ী। বছর বছর মহা ধূমধামে দুর্গাপূজা হয় সে বাড়ীতে। সেই পূজা সমারোহ দেখে; আর বিনোদের বিচারশীল মনে সংশয় জাগে। সংশয়ের পীড়নে ক্রমে বিনোদের মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী—

"জানব, দেখব, বুঝব, তবে বিশ্বাস করব। মা দুর্গা সত্যিই কি আছেন? সত্যিই কি তিনি প্রতিমার মধ্যে আছেন? পূজা ভোগ কি তিনি নেন? আমি তা নিজে দেখতে চাই, তবে বিশ্বাস করব, নতুবা আমি এ পুতুলের পূজা মানিনে।"

একদিন নিশীথ রাত্রি, সবাই যখন ঘুমিয়ে, বিনোদ নিজের সাধন কুটীর থেকে বেরিয়ে একাকী গেল হরবিলাসের বাড়ীতে। দশভুজা মহিষমৰ্দ্দিণী দেবী দুর্গার প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ আলো করে রয়েছেন। বিনোদ গিয়ে বসল ঠিক তার সামনে।

মনে তার সুদৃঢ় সঙ্কল্প—**"মা দুর্গা যদি সত্যই প্রতিমায় থাকেন, তবে আমাকে দেখা দিতেই হবে, নইলে আমি বিশ্বাস করব না, মানব না, প্রণাম করব না।"**

এমনি একান্ত সঙ্কল্প নিয়ে নিষ্পলক ভাবে দেবী প্রতিমার চোখের দিকে দৃষ্টি স্থির করে চেয়ে রইল। ক্ষণকাল পরেই বিনোদ তন্ময় হয়ে ডুবে গেল ভাব-সমাধিতে। বিনোদের দিব্য দর্শন হল।

কোথায় মাটির প্রতিমা? **বিনোদ দেখল তার সম্মুখে জাগ্রতা, দশভূজা মা দুর্গা, স্নেহ-বৎসলা জগজ্জননী। সন্তানের প্রতি তাঁর করুণাভরা অমৃত দৃষ্টি অধরে মধুর হাসিভরা আশ্বাস-বাণী, দক্ষিণ করে বরাভয় দিচ্ছেন ভক্ত সন্তানকে। কতক্ষণ পরে দেবীর উজ্জ্বল অঙ্গজ্যোতিঃ বিনোদের অঙ্গে প্রবেশ করল। বিনোদের সমাধি ভাঙল। সংশয়মুক্ত বালক। বিনোদ ফিরে গেল নিজের সাধন কুটীরে।**

সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যাঁর আবির্ভাব, কোটী কোটী নরনারীর হৃদয়ে যিনি ভক্তি-বিশ্বাস সাধনার বীজ বপন করবেন, যিনি স্বয়ং জগদগুরু রূপে অগণিত নরনারীর নতিস্তুতি পূজা-আরতি গ্রহণ পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চার করবেন তিনি কি গতানুগতিক বিশ্বাস ও আচারের স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে চলতে পারেন? প্রতি পদে পদে তাঁকে সত্য তত্ত্বকে জেনে, বুঝে, উপলব্ধি করে নিতে হয়।

বিনোদই ভবিষ্যৎ **আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ**। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর গুরু ও আরাধ্যদেবতা রূপে পূজিত, বন্দিত হয়ে তিনি নিত্যপাঠ্য গুরু-প্রণাম মন্ত্রের মাধ্যমে শিখিয়েছেন, যা লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ভক্তিভরে ত্রিসন্ধ্যা পঠিত হচ্ছে ঃ

মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্।।

॥ চার ॥

"ভারী দুরন্ত আপদ তো! রোজ রোজ ঘরে ঢুকে যাতে তাতে মুখ দেয়। ধরতে পারিস্ বেজীটাকে বুধো?" —একদিন অতি বিরক্ত হয়ে বললেন জননী সারদা দেবী বিনোদকে। বিনোদ তখন শিশু বললেও চলে।

একটা বেজী রোজ রোজ ভুঁইয়াদের পাকের ঘরে ঢুকে যাতে তাতে মুখ দেয়, খাবার পেলে খেয়ে নেয়। মায়ের কথায় সেদিন ধরবার সঙ্কল্প নিয়ে বিনোদ তাড়া করে ছুটল বেজীটার পেছন পেছনে। বেজীটাও প্রাণভয়ে দিল দৌড় ঝাড় জঙ্গলের পথে; বিনোদও তার পেছু নিল। ঝোপ ঝাড় কাঁটা খোঁচা কিছু মানল না। বেতের কাঁটায় গায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেল, পায়ের তলায় কত কাঁটা বিঁধতে লাগল। বিনোদ কিছুই গ্রাহ্য করল না। অদম্য তাঁর সঙ্কল্প। অবশেষে বেজীটাকে ধরে তার মায়ের কাছে এনে তার সঙ্কল্প পূর্ণ করে, পরে সেটাকে ছেড়ে দিল।

আজীবন বিনোদ ছিল—সঙ্কল্প সাধনার প্রতিমূর্ত্তি। যেমন বাল্য জীবনে, তেমনি গুরু, আচার্য্য, নেতা রূপে উত্তরকালে তিনি কদাচ একটি সঙ্কল্পও ব্যর্থ হতে দেননি। তিনি ছিলেন সিদ্ধসঙ্কল্প; যেমন অধ্যাত্ম সাধনায়, তেমনি জাতিগঠন-মূলক কর্ম্মসাধনায়, জীবন ভোর ছিলেন তেমনি সঙ্কল্পে অটল, অবিচল। পর্ব্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নও তাঁকে সঙ্কল্পিত কার্য্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বিপদাপদ, তা যত বড় ভয়ঙ্করই হোক না কেন, কদাচ তাঁকে সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। তাঁর নির্ভীক কণ্ঠে অহরহঃ বজ্রবাণী উচ্চারিত হত ঃ

"সঙ্কল্পে যে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হওয়ার পূর্বে যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।"

"ওহে—তোমরা সকলে এসে এই গাছটা ধরে ভারার উপর তুলে দাওতো।"

বিষ্ণু ভূঁইয়া একদিন লোকজনকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি চিরে তক্তা তৈরি হবে। করাতীরা বাঁশ দিয়ে ভারা বেঁধে গুঁড়িটার একদিকে ভারার উপর তুলবার আয়োজন করছে। সেইজন্যই ভুঁইয়া লোকজনকে ডাকছেন। করাতীদের সর্দার বলল—"কর্ত্তা, বেশী লোক ডাকতে অবে না। সাধু ভুঁইয়া একলা আইলেই অবে।" ভুঁইয়া তাদের বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে বললেন—"পান্তা ভাত খায়, আর দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে থাকে। ও চ্যাপসের গায়ে আবার জোর আছে নাকি?" সর্দার বলল—"না কর্ত্তা, সাধু ভুঁইয়ার গায়ে কিন্তু খুব জোর।"

ঠিক এমনি সময় বিনোদ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। বিষ্ণু ভুঁইয়া তাকে ডাক

দিলেন—"হেই বিনোদ! গাছটা ধরে ভারার উপর তুলে দিতে পারবি?" বিনোদ কোন উত্তর দিল না; ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দু'হাতে ধরে অনায়াসে গাছটার একদিক ভারার উপরে তুলে দিল। বিনোদ তখন মাত্র কৈশোর পদার্পণ করেছে।

বিষ্ণু ভুঁইয়া তো বিস্ময়ে অবাক্। বুঝলেন তিনি যে বিনোদের দৈহিক শক্তি কত খানি। মনে মনে ভাবলেন, দুধ-ঘি মাছ-মাংস খাওয়া জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রের চেয়ে নুন ভাত খাওয়া বিনোদের গায়ে শক্তি ঢের বেশী।

"ঐ রে! বিনোদ আসছে রে! ওর গায়ের জোরটা আজ পরীক্ষা করতে হবে। ডাক না ওকে নৌকাটা ধরতে। বিনোদ ধরলে সবাই কিন্তু হাত আল্‌গা দিবি, বুঝলি।"

পাড়ার একদল লোক একদিন রাস্তার পার্শ্ববর্তী খালের মধ্য থেকে একখানি ডিঙি নৌকা টেনে পাড়ে তুলছিল। সেদিকে আসতে দেখে তাদের মনে কৌতূহল জাগল যে বিনোদের গায়ের বল কত, আজ তা পরখ করতে হবে। তাদের নেতা বলল, "ভাই বিনোদ, একটু হাত লাগাও তো, আমরা পেরে উঠছিনে।" মৃদু হেসে বিনোদ এগিয়ে এল। বিনোদ ডিঙি নৌকাটা ধরতেই সকলে টান ছেড়ে দিয়ে নৌকোয় শুধু তাদের হাত ঠেকিয়ে রাখল। বিনোদ কিন্তু একাই নৌকাখানাকে টেনে ডাঙায় তুলে দিল।

সকলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে বিনোদের প্রশংসা করতে লাগল "আশ্চর্য্য ভাই! তোমার গায়ে যে এত বল, তাতো আমরা জানতাম না। তোমার গায়ের জোর দেখবার জন্যই আমরা কিন্তু টান ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

"ভুঁইয়া তুমি মোর ধর্ম্মের বাপ! এমুন কাম আর করুম্ না'—বলতে বলতে এক মুসলমান গুণ্ডা বিনোদের পায়ের উপর পড়ে কাতর কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

বাজিতপুর গ্রামে এক দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমান ছিল। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলে তাকে ভয় করত। নিজ শক্তির দর্পে গুণ্ডাটি কাউকে গ্রাহ্য করত না। ফলে অনেকে তার হাতে লাঞ্ছিত হয়েও নীরবে অপমান হজম করে যেতে বাধ্য হত।

একদিন বাজারে কী একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধে। গুণ্ডাটি হিন্দুদের মারবে বলে শাসাল। বাজারে উপস্থিত হিন্দুরা হল আতঙ্কিত; টুঁ শব্দটি কারো মুখে বেরুল না। ঘটনাটি দ্রুত সমগ্র গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল; বিনোদের কানেও তা পৌঁছল। বিনোদ ভাবল, "গুণ্ডাটির গুণ্ডামির সীমা ছাড়িয়েছে, আর ক্ষমা করা উচিত হবে না। অবিলম্বে শাসন দমন আবশ্যক। নতুবা গ্রামের শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকেরা বাস করতে পারবে না।"

দুষ্টদমনের সঙ্কল্প নিয়ে বিনোদের অন্তরের ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটি জেগে উঠলেন। বিনোদ স্বীয় সাধন কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে খালের পাড়ে বাজারে যাতায়াতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। গুণ্ডাটি কাছে আসতেই বিনোদ কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল—

"হেই সর্দ্দারের পো! হিন্দুদের তুই কী বলেছিস্? মারবি বলে নাকি শাসিয়েছিস্?" বিন্দুমাত্র না দ'মে গুণ্ডাটি উত্তর করল—"হঃ! বল্ছিই তো! তাতে অইছে কী? হিন্দুগো মারুমইতো! তা কী অর্বা?"

অকস্মাৎ চোখের পলকে বিনোদ গুণ্ডাটির দু'পা ধরে তুলে আছাড় মারল। আহত ও ভীত হয়ে গুণ্ডা বিনোদের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। তারপর গ্রামের শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সাথে সাথে বিনোদের শক্তির কথা মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল।

এই কিশোর বিনোদই পরবর্ত্তী কালে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দরূপে হিন্দুজাতি গঠনের কর্ম্মধারা নিয়ে দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। উৎপীড়িত লাঞ্ছিত দুর্গত ভীত হিন্দু জনতাকে আশ্বাসদান ও রক্ষণের জন্য সাম্প্রদায়িক দুর্ব্বৃত্তগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক সশস্ত্র **'হিন্দু রক্ষিদল'** গঠন করেছিলেন। সে কথা পরে আসবে।

"বড় ভূঁইয়া! মোরা অনেক দূর থন আপনের পোলার কতা হুইন্যা দ্যাখ্তে আইচি।"

"ক্যানরে! কি হয়েছে আমার পোলার? কি দেখতে আসছ?"

একদিন কয়েকজন মুসলমান পালোয়ান বিষ্ণু ভূঁইয়ার বাড়ীতে এসে তাঁর সাথে আলাপ করছিল। তারা দূর গ্রাম থেকে এসেছে। তারা পরস্পর শুনেছে

যে বাজিতপুরের বিষ্ণু ভূঁইয়ার এক ছেলে খুব বলবান। তার ভয়ে-গ্রামের গুণ্ডারা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তারা ভূঁইয়ার সেই ছেলেটিকে একবার দেখতে এসেছে।

বিষ্ণু ভূঁইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ বিনোদের কুটীরখানি দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"ঐ যে ঘরের মধ্যে আছে।"

আগত পালোয়ানরা কুটীরের দরজায় টোকা দিয়ে অনুরোধ জানাল,—"ভূঁইয়া, দুয়ারডা খোলেন দেহি এ্যাকবার! মোরা দূর গেরামের থন আপনের নাম হুইন্যা দ্যাখ্‌তে আইচি।"

বারবার ডাকাডাকি করতে বিনোদ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল তারা খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর পালোয়ানরা বলল,—"ভূঁইয়া আপনের গায়ে নাকি (নাকি) খুব শক্তি? আমাগো এট্টু দেহান্ যদি তবে খুশি অইয়্যা চইল্যা যাই। অনেক দূর থন আশা কইরা আইচি।"

বিনোদ বার বার নানা কথা বলে তাদের অনুরোধ উপরোধ এড়াবার চেষ্টা করছিল। কিছুতেই যখন তারা ছাড়ে না, তখন আচম্বিতে কোন কিছু ভাববার বা করবার অবসর বা সুযোগ না দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে এক একজনকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বিস্মিত স্তম্ভিত পালোয়ানরা বিনোদকে "ওস্তাদ" মেনে সেলাম দিয়ে চলে গেল।

ঋষি বলেছেন—**"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"**—বলহীন ব্যক্তি ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে না। এই বল শুধু আধ্যাত্মিক বল নয়। এই বল যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি মানসিক, তেমনি শারীরিক। বিনোদের জীবনে এই তিন রকম বলেরই সমুৎকর্ষ ঘটেছিল। **সর্ব্ববিধ শক্তির পূর্ণ সমন্বয়মূর্ত্তি ছিলেন বিনোদ—ভবিষ্য আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

"**বিনোদ**! তুমি নুন ভাত খাও কেন? তোমার মা বাবার প্রাণে এতে কত দুঃখ লাগে, তা কি বোঝ না? মাছ মাংস না হয় না-ই খেলে! কিন্তু দুধ ঘি একটু আধটু খেলে দোষ কি? দুধ ঘি তো সাত্ত্বিক খাদ্য। এ খেতে তো বহ্মচারীদের কোন বাধা নেই"—বিনোদকে একদিন একান্তে অনুরোধ জানায় মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহেন্দ্র, ভূঁইয়া-বংশের কুল-পুরোহিতের ছেলে বাজিতপুরেই বাড়ী। বিনোদের চেয়ে বয়সে বড়। বিনোদের বাবা মহেন্দ্রকে একদিন বললেন—

"মহেন্দ্র, বিনোদ তো শুধু নুন ভাত খায়, তা তুমি তাকে একটু বলে কয়ে দেখ। মাছ-মাংস না খাক্, একটু দুধ ঘি যদি সে খায়, তবে তো প্রাণে একটু শান্তি পাই।" মহেন্দ্র একান্তে একদিন বিনোদকে পেয়ে খুব অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল—যাতে বিনোদ দুধ ঘি খেতে রাজী হয়।

উত্তরে বিনোদ দৃঢ়কণ্ঠে সান্ত্বনার সুরে বলল, "ঠাকুর মশায়! **ভগবান্ আমাকে যেটুকু শক্তি দিয়েছেন, আমি যদি তা নষ্ট হতে না দিই, তাহলে আর দুধ খাবার দরকার হবে না; দেখেন নি একটা কড়াইতে আধ কড়াই দুধ নিয়ে জ্বাল দিলে তা উথলে উঠে কড়াই ছাপিয়ে পড়ে যায়? ঠিক তেমনি আমি যে শক্তি নিয়ে জন্মেছি—দুধ, ঘি, গুরুপাক খাদ্য খেয়ে যদি শরীরকে উত্তেজিত করি, তবে সেই শক্তি বেরিয়ে যাবে, রক্ষা করতে পারব না। ঐ শক্তি যাতে এক বিন্দুও নষ্ট না হয়, সে জন্যই আমি নুন ভাত খাই, কম ঘুমাই খুব ব্যায়াম করি, কঠোর সংযম-মূলক নিয়ম পালন করি। ঐ শক্তি অটুটভাবে রক্ষার ফলে আমার শরীরে এতো তেজঃ যে মনে হয় যেন এই দালানটাকে লাথি মেরে উল্‌টে দিতে পারি।**"

মহেন্দ্র নির্ব্বাক। নূতন দৃষ্টি খুলে গেল তার। আজ আর একবার সে ভাল করে দেখল বিনোদকে সম্পূর্ণ নূতন চোখে—কী সুন্দর, সুগঠিত সুবলিত সুঠাম সুসৌষ্ঠব দেহ; ব্রহ্মচর্য্যের তেজঃ সর্ব্বাঙ্গে যেন ফেটে পড়ছে। বিনোদের

জ্যোতির্ম্ময় মুখ কমলের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে চেয়ে মহেন্দ্র ভাবতে লাগল—"সত্যিই তো। শুধু খেলে কী হবে? শরীরের ক্ষয় বন্ধ করতে হবে। বীর্য্য ক্ষয় যদি বন্ধ হয়, তবে খাদ্যের প্রয়োজন অতি সামান্যই। শুধু নুন ভাতেই শরীর পুষ্ট হবে। বিনোদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শক্তিমান কান্তিমান্ বিশাল দেহখানিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।"

॥ দুই ॥

"বিনোদ ভাই। তোমার মত স্বাস্থ্য আর শক্তি হয় কী করে? তুমি তো খাও নুন ভাত, কিন্তু আমি তো খাই পুষ্টিকর খাদ্য মাছ, মাংস, দুধ, ঘি। ব্যায়ামও রোজ নিয়মিত করি। কিন্তু শরীর তো তোমার মত হয় না।"

একদিন বিনোদেরই এক অন্তরঙ্গ সহপাঠী হীরালাল ঘোষ তাকে উক্ত প্রশ্ন করল। বিনোদ তখন তাকে বুঝিয়ে বলল—

"শুধু খেলে আর ব্যায়াম করলে কী হবে রে হীরু; যা খাস, তা পরিপাক হয়ে কয়েক বিন্দু শুক্র-ধাতুতে পরিণত হয়, অচিন্তা-কুচিন্তায়, কুস্বপ্নে, অসংযমে যদি সেই সার পদার্থ ক্ষয় হয়, তবে শরীরে পুষ্টি ও শক্তি আসবে কেমন করে? বীর্য্যধারণ করতে হবে, তার জন্য সংযম পালন করা চাই।"

'বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলবি নে, কারো দিকে তাকাবি নে, কোথাও যাবি নে, লোভের বশে খাবি নে, অক্ষুধায় খাবি নে, গুরুপাক খাদ্য খাবি নে, চার পাঁচ ঘন্টার বেশী ঘুমোবি নে, দিনে ঘুমোবি নে, বাজে চিন্তা কুভাবনা মনে আসতে দিবি নে, সর্ব্বদা কাজে নিযুক্ত থাকবি। এমনি ভাবে সংযম পালন করলে মন স্থির হবে, ইন্দ্রিয় সংযত শান্ত হবে, তবেই বীর্য্য স্থির হবে। তখন দেখবি—শরীর কী হয়।

"তোরা Young man তোদেরই তো সময়। প্রাণপণে বীর্য ধারণ করবি। শরীরে শক্তি হবে, মনে তেজঃ আসবে, দেবতা হয়ে যাবি।"

হীরালাল ঘোষের মত বহু বালক ও যুবক বিনোদের উপদেশে ও তার আচরণ দেখে ইন্দ্রিয়-সংযম ও বীর্য্যধারণের সঙ্কল্প নিয়ে চলত। দূর দূর গ্রামের ছেলেরাও

শনি-রবিবার বা ছুটির দিনে বাজিতপুরে বিনোদের কাছে আসত। স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত বিনোদ তাদের উপদেশ দিত। এমনি ভাবে বহু গ্রামের বহু বালক ও যুবক বিনোদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

"জিতুকে শীগ্‌গির কবিরাজ ডাকতে পাঠাও"—উদ্বগ্ন চিত্তে বিষ্ণু ভুঁইয়া আদেশ করলেন।

কুল পুরোহিত, আবাল্য বন্ধু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর সাথে বসে বিষ্ণু ভুঁইয়া আলাপ আলোচনা করছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ এলো যে বিনোদের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ভুঁইয়া অতি মাত্র ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার কবিরাজ ডাকবার আয়োজন করছেন। বিনোদ একেই কথা বলে কম; পিতা বিষ্ণু ভূঁইয়ার সাথে তো কথা তার হ'তই না।

এখুনি ডাক্তার কবরেজ ডেকে ওষুধপত্র নিয়ে একটা মহামারী কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে আশঙ্কায়, বিনোদ একান্তে কালীপ্রসন্ন বাবুকে ডেকে বলল—

"দেখুন ঠাকুর মশায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকাডাকির কোন দরকার নেই; এমনিতেই ভাল হয়ে যাবে। যোগ-সাধনার জন্য এটা হয়েছে, যোগ প্রক্রিয়াতেই ভাল হয়ে যাবে। শ্বাস নেবার সঙ্গেই কুম্ভকে বায়ু গিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করায় রক্তপাত হয়েছে। অসুখ বিসুখ কিছু নয়।

কালীপ্রসন্ন বললেন—"তুমি তো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাও না, যোগ-সাধনা শিখলে কেমন করে?"

"কারো কাছ থেকে শিখতে হয়নি; ওসব আমার জানা আছে" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল বিনোদ।

সত্যিই তো! যিনি স্বয়ং শিব, শিব-বরে জন্ম যার, তার যোগ-সাধনা শিখতে গুরু লাগবে কেন? তিনিই তো মহাযোগেশ্বর।

কালীপ্রসন্ন এসে বিষ্ণু ভুঁইয়াকে বিনোদের কথাগুলি বললে ডাক্তার কবরেজ ডাকাডাকির পর্ব্ব বন্ধ হয়ে গেল। ভুঁইয়ার স্মৃতিতে মহাদেবের বরদান কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিনোদের প্রতি তাঁর বিশেষ সম্ভ্রম জাগল।

সতীর্থ বন্ধু হীরালাল ঘোষ আর একদিন বিনোদকে ধরে বসল ঃ

"বিনোদ, ভাই! তুমি কীসের সাধনা কর? দিনরাত তো তোমাকে ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসে থাকতে দেখি। সাধনা তপস্যা করতে হলে পাহাড়ে পর্ব্বতে যাওয়া লাগে, তীর্থে তপোবনে থাকা লাগে, ঘরে বসে বসে কি সাধনা হয়?"

এ শুধু হীরালালের মনের কথা নয়, গ্রামবাসী অনেকেরই অন্তরে এই জিজ্ঞাসা। তারা দেখে যে বিনোদ জন্মাবধি পিতৃগৃহ থেকে কোথাও যায়নি, গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেই কেটে গেল তার শৈশব, বাল্য, কৈশোর। বিনোদ স্কুলে যায়, ব্যায়াম খেলাধুলোতে কখনো কখনো যোগদান করে। পিতামাতা অভিভাবকদের কথামত ঘরের কাজও অবসর সময়ে কদাচিৎ করে। এ সবের মধ্যে তার অসাধারণত্ব কিছু নেই। তথাপি তারা বিনোদের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে যায়।

মুখে তার স্বর্গের সুষমা, কণ্ঠে তার সুধা মাখান মৃতসঞ্জীবনী বাণী, চক্ষে তার অমৃত-ভরা দৃষ্টি, পবিত্রতার জ্যোতিঃ তার সর্ব্বাঙ্গে; যেখান দিয়ে সে হেঁটে চলে যায় তথায় পবিত্রতার বাতাস বয়ে যায়, যার সাথে কথা কয় তার প্রাণে আনন্দের হিল্লোল উঠে, তার সকল দুঃখ অশান্তির অবসান হয়।

সকলেরই কাছে এ এক দুর্বোধ্য রহস্য। ভেবে চিন্তে কেউ থই পেত না। তাই তো অন্তরঙ্গ বন্ধুর জিজ্ঞসা ঃ

"বিনোদ ভাই! কীসের সাধনা কর?"

বিনোদের মুখ স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মধুর কণ্ঠে সে উত্তর দিল—সহজ, সরল ঃ

"আমি করি ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা?"

"বীর্য্যধারণের সাধনাই তো ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা?

"হাঁ।"

"তা তো তুমি আমাদেরও করতে বলেছ।"

"হাঁ, আমি যা করি, সকলকে তাই তো করতে বলি। ব্রহ্মচর্য্য পালনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। স্বয়ং শিবের বাক্য—"ব্রহ্মচর্য্য পালনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা।"

"শুনেছি সাধু সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে, পর্ব্বতে, তপোবনে গিয়ে নির্জ্জনে কত তপস্যা, যোগ সাধনা করেন?"

"তাঁদেরও উদ্দেশ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন, রিপুদমন, ইন্দ্রিয়-সংযম, বীর্য্যধারণ। সংসারের পরিবেশে নানা বাধাবিঘ্ন ও বহুবিধ প্রলোভনে মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়-সংযমে ব্যাঘাত ঘটে, এই ধারণায় তাঁরা সংসার সমাজ থেকে দূরে নির্জ্জনে থাকতে চান।"

"কিন্তু ভাই, তুমি তো সংসার থেকে দূরে যাওনি! তুমি তো চিরকাল বাড়ীতেই আছ?"

"দেখ্, মন ইন্দ্রিয় যার বশে আছে, জানবি সে সর্ব্বদা নির্জ্জনেই আছে। আর মনকে যে জয় করতে পারেনি ইন্দ্রিয় যার ভোগের জন্য লোলুপ, নির্জ্জনে গেলেও তার শান্তি নেই; তার ইন্দ্রিয়-সংযম হয় না; সুতরাং বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্য পালনও তার হয় না। আচার্য্য শঙ্করের উপদেশ জানিস? 'জগতকে জয় করেছে কে? মনকে জয় করেছে যে'।"

"তোমার মনকে কি তুমি জয় করতে পেরেছ? তোমার ইন্দ্রিয় কি তোমার বশীভূত?"

"হ্যাঁ।"

"কী রূপে তুমি মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করলে?"

"সংযম-সাধনার দ্বারা।"

"সংযম-সাধনাটা কীরূপ?"

"তা তো তোদের বলেই থাকি—**আহার সংযম, নিদ্রা সংযম, বাক্ সংযম শ্রুতি সংযম, সঙ্কল্প-রক্ষা আর বিবেক-বিচার।**"

"এর দ্বারাই কি ভগবান্ লাভ হয়?"

"হাঁ।"

"তবে যে সাধকরা যোগ যাগ-তপস্যা, তান্ত্রিক কত কী সাধনা অনুষ্ঠান করেন?"

"সকলের উদ্দেশ্য তো ভগবান্ লাভ নয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা সে সব করেন।"

"মনকে জয় করলেই কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?"

"হাঁ, শুধু পাওয়া নয়, ভগবান্ হওয়া যায়।"

"তার মানে?"

"মানে—**জীবই তো শিব। নরের মধ্যেই তো নারায়ণ। মানুষের মন মলিন ও চঞ্চল। তাই মানুষ নিজেকে জানতে পারছে না। মন স্থির নিশ্চল শুদ্ধ হয়ে গেলেই অজ্ঞানের আবরণ খসে যায়। তখন সে দেখে বোঝে যে সে-ই ভগবান্।**"

এরূপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সেদিন হীরালালের মনের সংশয় ঘুচে গেল। হীরালাল এতদিন পরে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে বিনোদ কেন এত কঠোর সংযম পালন করে এবং কেন সে সকল বালক ও যুবককে সংযম পালন করতে বলে; চারিদিকে এত হৈ হুল্লোড়, এত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও বিনোদ কেন শান্ত, ধীর, স্থির, আত্মমগ্ন; হীরালালের মুখে শুনে আরো অনেকের মনের সংশয় মিটে গিয়েছিল।

॥ তিন ॥

"ভাল লাগছে না মাষ্টার মশায়! আমি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যাব, সন্ন্যাসী হব, নতুবা দেশকে রক্ষা করা যাবে না!" অশান্ত কণ্ঠে বিনোদ একদিন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্র বাবুর নিকট উপরোক্ত প্রস্তাব করে বসল।

বিনোদ ধৈর্য্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। তাকে প্রধান শিক্ষক কদাচ কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হতে দেখেন নি। আজ তারই কণ্ঠে এমনতর ব্যাকুলতার আভাস পেয়ে প্রধান শিক্ষক অবাক্ হয়ে বিনোদের প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেন, কী হ'ল বিনোদ?"

বিনোদ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে চলল, "মাষ্টার মশায়! আপনি জানেন না, আমি জানি—সংযমহারা, ব্রহ্মচর্য্যহীন ছেলের দল উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। কী হবে এই সমস্ত হীনবীর্য্য, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ যুবকদের দিয়ে?"

বীরেন্দ্রবাবু তাঁর প্রিয়তম ছাত্রের এই আকস্মিক ভাবাবেগের যথার্থ রহস্য না বুঝে শঙ্কিত হলেন। বললেন "বিনোদ! সংসার ছেড়ে কোথায় যাবি? কার পাল্লায়

পড়ে জীবনটা খোয়াবি! তার চেয়ে চল্ গোরক্ষপুরে বাবা গম্ভীরনাথজীর কাছে। আমি তাঁর পায়ে মাথা বিকিয়েছি। তাঁর কাছে গেলে তুই পথ পাবি।"

বিনোদ আপত্তি করে বসল ঃ

"মানুষ আবার গুরু হয় কেমন করে, মাস্টার মশায়?" নিজের যতটা জ্ঞানবুদ্ধি ছিল, তা দিয়ে যুক্তি তর্ক করে বীরেন্দ্রবাবু বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু বিনোদকে বাগ মানানো তাঁর অসাধ্য। বিনোদ চলে গেল।

"চলুন মাষ্টার মশায়! আমি গোরক্ষপুরের যাব"—কয়েকদিন পরে হাসতে হাসতে বিনোদ এসে বলল বীরেন্দ্রবাবুকে। বীরেন্দ্রবাবু সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন যে বিনোদের মুখে তৃপ্তির স্নিগ্ধ আভা মেঘমুক্ত শশধরের মত তার বদন মণ্ডল প্রসন্ন উজ্জ্বল। তিনি বুঝলেন যে বিনোদের অন্তর যে সংশয়ের পীড়নে অশান্ত ছিল তার সমাধান সে পেয়েছে। দেশের তথা তরুণ সমাজের পরিত্রাণের নিশ্চিত পথ সে আবিষ্কার করেছে।

"য়হ কৌন্ হ্যায়? ইস্‌কো তুম্ কাঁহাসে লায়ে হো? য়হ তো জনম্‌সে হি সিদ্ধ-যোগী হ্যায়।"

বিনোদের প্রতি গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে সবিস্ময়ে বললেন—বাবা যোগিরাজ গম্ভীরনাথজী।

বিনোদকে সাথে নিয়ে বীরেন্দ্রবাবু গোরক্ষপুর মঠে বাবা গম্ভীরনাথজীর চরণে উপস্থিত হলে বিস্মিত চমকিত হয়ে তিনি বীরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ বালকটিকে? কোথা থেকে একে নিয়ে এলে? এ তো জন্ম থেকেই সিদ্ধ-যোগী।" বীরেন্দ্রবাবু পরিচয় দিলেন। নাথজী সানন্দে বিনোদকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর বিনোদ কিছুকাল গোরক্ষপুর মঠেই রইলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণ অন্তর্মুখী হয়ে মঠের সন্নিহিত গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিরন্তর সমাধিতে ডুবে থাকতেন। নাথজী তাঁকে খুঁজে পেতে এনে জোর করে কিছু কিছু খাইয়ে দিতেন।

মঠের একজন ব্রহ্মচারী—নাম কালীনাথ, বিনোদের যোগযুক্ত অবস্থা বুঝতে পারত না। সে মাঝে মাঝে অভিভাবকতার ভঙ্গীতে বলত—"সারাদিন তুমি

কোথায় থাক? খাবার সময়েই তো শুধু তোমাকে দেখি। না কর গুরুসেবা, না কর মঠের কোনো কাজ। এখানে থাকতে হলে এখানকার কাজ করতে হয়" ইত্যাদি।

একে স্বল্পভাষী, তারপর দীক্ষার মুহূর্ত্ত হতে নিরন্তর অন্তর্মুখী ভাব, বিনোদের কানে ওসব কথা প্রবেশই করত না। কখনো কখনো শুনলেও কোনো উত্তর দেবার মত অবস্থা তাঁর ছিল না! একদিন মাত্র স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—"আমি কী করি, না করি, তা নাথজীর কাছেই জিজ্ঞসা কোরো।"

কিছুকাল পরে বাবা গম্ভীরনাথজীর আদেশে বিনোদ এলেন কাশীধামে। তথায় অসিঘাটের নির্জ্জন স্থানে তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় থাকতেন। জনৈকা বৃদ্ধা তখন তাঁর সেবার ভার গ্রহণ করে। এই সময়ে বিনোদের ব্যাকুল আহ্বানে নাথজী মাঝে মাঝে যোগবলে তাঁকে দর্শন ও আবশ্যক নির্দ্দেশ দিতেন। যোগিরাজ গম্ভীরনাথজী বিনোদকে উপযুক্ত পাত্র বুঝে নিজের অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্য সঞ্চার করতে প্রস্তুত হন।

একদিন বিনোদের আগ্রহে স্বীয় অষ্টসিদ্ধি প্রদর্শনের ছলে নাথজী স্বীয় যোগৈশ্বর্য্য বিনোদের মধ্যে সঞ্চার করলেন। পরবর্ত্তী কালে বিনোদ যখন আচার্য্য প্রণবানন্দ নামে বিখ্যাত, সেই সময়ে স্বীয় উত্তর-সাধক সন্তানগণকে সন্ন্যাস দানের সময়ে বিনোদ বলেছিলেন, বাবা গম্ভীরনাথজী এত বড় যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন যে তাঁর আদেশে চন্দ্র সূর্য্য কক্ষচ্যুত হতে পারত;আজ যদি তিনি উপস্থিত থাকতেন তবে তিনিও—আমি যা করতে যাচ্ছি, তা বুঝতেন কিনা সন্দেহ।"

এ থেকে বোঝা যায় যে নাথজী উপযুক্ত আধার পেয়ে স্বীয় যোগৈশ্বর্য্য বিনোদকে সমর্পণ করলেন বটে;কিন্তু সেই শক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে বিনোদ যে কী জগৎ-কল্যাণ উদ্দেশ্য সাধন করবেন, তা অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

"ভোলা, সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে পারবি?"—বিনোদ বললেন তাঁর কনিষ্ঠ ভাইকে।

"কেন পারব না, কোথায় থাকতে হবে? সানন্দে জবাব দিল ভোলা।

"আমি শ্মশানখোলায় রোজ ধ্যানে বসব, তুই রাস্তার ধারে ত্রিশুল নিয়ে পাহারা দিবি।"

"পাহারা দিতে হবে কেন? ভয় করে নাকি?"

"না রে না, ভয় না! লোকে ভয় না পায় তার জন্য; আর আমার ধ্যানে কোনো ব্যাঘাত না আসে সেজন্যও বটে।"

ভোলা সোৎসাহে রাজী হয়ে গেল! পরবর্ত্তী কালে ভোলার কথা উঠলেই আচার্য্যদেব (বিনোদ) বলতেন—"ভোলা ছিল যেন রামের ভাই লক্ষ্মণ; আমার উত্তরসাধক, সারারাত ত্রিশুল হাতে আমাকে পাহারা দিত। মৃত্যুশয্যায় তাকে আমি মন্ত্র দিই, সেই-ই আমার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। মৃত্যুশয্যায় সে মনে করেছিল যে দাদা এত বড় যোগী, নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তা কি হয়? মহাযোগীরাও কদাচ নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করেন না!"

বৎসরাধিক কাল কাশীধামে থেকে নাথজীর নির্দ্দেশে বিনোদ ফিরে এলেন জন্মভূমি বাজিতপুরে। এখানে তিনি সমস্ত দিন স্বীয় সাধন কুটিরে এবং সমস্ত রাত্রি শ্মশানে সমাধিমগ্ন থাকতেন। এই ভাবে আরও দুটি বছর কাটল। **এল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমা। বিনোদের দেহমনে শুরু হল শ্রীভগবানের মহাপ্রকাশ।** সেই থেকে পরবর্ত্তী প্রায় পঁচিশটী বছর একাদিক্রমে বিনোদের দেহমনে চলেছিল বিশ্বনিয়ন্তার মহাপ্রকাশের মহালীলা। সেই কথাই সংক্ষেপে বলব অধ্যায়ে অধ্যায়ে।

॥ চার ॥

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাস।

"চল্ যাই ওপার, একটু কাজ আছে"—ডাকলেন ব্রহ্মচারী বিনোদ কয়েকজন অন্তরঙ্গ যুবক সঙ্গীকে। সঙ্গীরা কিঞ্চিৎ ভীতি-মিশ্রিত সুরে আপত্তি জানাল, "ওপারে ঐ ভূতুড়ে জঙ্গলের মধ্যে আবার কী কাজ?" বিনোদ তাদের আশ্বাস দিলেন—"আছে, আছে, চল্ না। এত ভয় কীসের? আমি তো সাথেই আছি।"

ভুঁইয়া বাড়ীর অনতিদূরে বাজারে যাতায়াতের রাস্তা; রাস্তার পাশেই খাল। খালের পারেই শ্মশান। শ্মশানখোলার ঠিক অপর পারেই খালের পাড় থেকে শ্যাওড়া বৃক্ষকুঞ্জের বিস্তৃত ঘন জঙ্গল ও বেতের ঝোপ। খালটি সমকোণাকারে

এই জঙ্গলাকীর্ণ ভীতিকর ক্ষেত্রটিকে বেষ্টন করে বয়ে গেছে। জঙ্গল এমনিতর ঘন যে সূর্য্যের আলো তেমন প্রবেশ করতে পারে না। জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষেত্রটি বর্ষাকালে পদ্মার বানে ভেসে যায়, প্রায় পাঁচ মাস কাল জলের তলে থাকে। জায়গাটি সম্বন্ধে নানা প্রকার ভীতিজনক গ্রাম্য প্রবাদও শোনা যেত। এ হেন স্থানে দিনের বেলাতেও একাকী যেতে লোকে ভীত হত। বুড়াঠাকুরাণীর (বনদুর্গা দেবীর) পূজার স্থান এই অরণ্যখণ্ডটির মধ্যে থাকায় বছরে মাত্র এক আধ দিনই দল বেঁধে গ্রামবাসীরা ঢাক ঢোল বাজিয়ে সেখানে পূজা দিতে যেত।

খাল পার হয়ে সঙ্গিগণ সহ ব্রহ্মচারী বিনোদ ঢুকলেন সেই অরণ্যে। ঘুরে ঘুরে চার দিক বেশ করে দেখে নিয়ে মাঝখানে খানিকটা স্থান নির্দ্দেশ করে বললেনঃ

"এইখানটাই ঠিক হবে।" সঙ্গীরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল— কী হবে? "এই খানেই শিক্ষা দীক্ষা দেব। হাজার হাজার তরুণ কর্ম্মী এখান থেকে বের হবে। দেখবি—কী হয়। নে এখন কোমর বেঁধে ঝোপ-ঝাড় গাছ-গাছালি কেটে সাফ করে ফেল্ দেখি।"

সঙ্গীদের প্রাণে জাগল অপার আনন্দ। বিনোদ তাদের প্রিয়তম নেতা, তাঁকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাদেরই জন্য বিনোদ আশ্রম স্থাপন করবেন ভেবে তারা মহোল্লাসে মহোদ্যমে জঙ্গল সাফ্ করতে লেগে গেল। তারপর মাটি ফেলে উঁচু করে জায়গাটা বাঁধল। কয়েক দিনের প্রচেষ্টায় সেখানে একখানা ঘর উঠিয়ে ফেলল।

"এখানে এবার মহোৎসব করব আগামী মাঘী পূর্ণিমায়। শীগ্গির আয়োজন করে ফেল" বিনোদের মুখে একথা শুনে তারা চিন্তিত হল—চাল, ডাল, কাঠ, টাকা-পয়সা কি করে যোগাড় হবে? বিনোদ বললেন "চিন্তা কিসের? চল সকলে গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা করব।" গ্রামের বালক ও যুবকগণকে দলবদ্ধ করে নিয়ে তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে জিনষপত্র টাকা পয়সা সংগ্রহ করে ফেলল। বিনোদ গ্রামে সকলের প্রিয়। বিনোদ আশ্রম করছে, তাঁর সেই আশ্রমে হবে মহোৎসব, এতে গ্রামের নরনারী সকলেরই আনন্দ। যথাসাধ্য দান সকলেই করল।

পুণ্যময়ী মাঘী পূর্ণিমা তিথি। সমস্ত রাত্রি মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্য-ধ্বনিতে দলে

দলে ভক্তগণের সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হয়ে রইল সেই নিবিড় বনভূমি। ভয়ের জঙ্গলে আজ আনন্দের শিহরণ; গ্রামবাসিগণের হর্ষ-কলরবে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত। কিন্তু যাকে নিয়ে এই উৎসব আনন্দ, উৎসবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা সেই ব্রহ্মচারী বিনোদ কোথায়? এই মহাপুণ্য শুভলগ্নে ব্রহ্মচারী বিনোদ উৎসব ক্ষেত্রের অদূরে এক নির্জ্জন কদম্ব বৃক্ষতলে ধ্যানাসনে সমাহিত। ব্যাহ্যজ্ঞানশূন্য দেহখানি তাঁর ঋজু কাষ্ঠখণ্ডের মত নিথর, নিশ্চল। তাঁর মধ্যে আজ বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বনাথের মহাপ্রকাশ। তাঁর দেব-অঙ্গ হতে বিকীর্ণ দিব্য জ্যোতিরাশিতে বৃক্ষতল আলোকিত।

শিববরে জন্ম, শিব-স্বরূপ বিনোদের মধ্যে যে মহাশক্তি বীজরূপে কুণ্ডলিত হয়ে কুঁড়ির আকারে ছিল, জন্মাবধি ধীরে ধীরে যে মহাশক্তি সাধনার প্রভাবে ফুটন্ত পদ্মের মত শতেক দল মেলে শোভায়, সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছিল, এই মহাপুণ্য মাঘী পূর্ণিমায় ঘটল তার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রকাশ, দেবাদিদেব মহাদেব এতদিনে আত্মপ্রকাশ করলেন।

সমাধির অবসানে পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাঁর বিশাল হৃদয়ে অঙ্কুরিত হল ঐশ্বরিক সঙ্কল্পের বীজ। সেই অঙ্কুর থেকে কালে যে মহামহীরূহের আবির্ভাব ও দেশে বিদেশে শাখা-বাহু বিস্তার, **সে হচ্ছে "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ"। মাঘী পূর্ণিমায় বিনোদের জন্ম, মাঘী পূর্ণিমায় তাঁর মহাতপঃসিদ্ধি আবার মাঘী পূর্ণিমা তিথিতেই তাঁর মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা।**

এখন থেকে বিনোদ আর বিনোদ রইলেন না। তিনি হলেন "দেহধারী জাগ্রত জীবন্ত সচল নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ।" বিশ্বের মর্ম্মঘাতী দুঃখ-জ্বালা, ব্যথা-বেদনার বিষ নিরন্তর তাঁর বিশাল হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল। আর বিশ্বের কোটী কোটী সন্তানের সেবা ও রক্ষার জন্য তাঁর জীবনের প্রতিটি চিন্তা, বাক্য কার্য্য, দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত উৎসর্গিত হল। সে অপার করুণার লীলা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

"হেই বুধা! দুধের বাটী হাতে বাগানের দিকে যাচ্ছিস্ কোথায়?"

বিনোদ তখন শিশু। তাকে বাটীতে দুধ নিয়ে গৃহ-পার্শ্বস্থ জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে ডাক দিল বুড়ী—বিনোদের দিদি হেমাঙ্গিনী। শৈশব কাল থেকেই বিনোদের প্রাণ সতত জীব-দুঃখেকাতর। বাগানের প্রান্তে ঝোপের মধ্যে একটা গোসাপের বাচ্চা অসুস্থ ও অচল হয়ে পড়েছিল। কেমন করে তা বিনোদের চোখে পড়েছে, কেঁদে উঠেছে শিশু বিনোদের প্রাণ। তাই সে দুধ নিয়ে চলেছে গোসাপটিকে খাওয়াতে। কয়েক দিন ধরে সে এমনিভাবে গোসাপটিকে সেবা করল। সুস্থ হয়ে চলে গেল গোসাপটি। বিনোদের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না।

ভবিষ্যতে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যরূপে ভারতের কোটী কোটী দুঃস্থ বিপন্ন নিঃস্ব অস্পৃশ্য অনাচরণীয় অশিক্ষিত অত্যাচারিত নরনারীকে যিনি সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে সন্তানের মত তাদের দুঃখ মোচন ও গ্লানি ম্লানি দূর করবেন, শিশু বিনোদের এই গোসাপের সেবার চিত্রটির মধ্য দিয়ে সেই জীব-দুঃখে করুণা-কাতর মহাপ্রাণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। শিশুর হৃদয়ের যে জীব-করুণা ও জীব-সেবার অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল, বয়োবৃদ্ধির সাথে তা' ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হচ্ছিল।

"মার্, মার্ বৈঠার বাড়ি মার্, মাছটার মাথায়, নইলে লাফ দিয়ে পালাবে!" বালক বিনোদকে আদেশ করল কঠোর স্বরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতু ভুঁইয়া।

বিনোদ তখন নিতান্ত বালক। কিন্তু বর্ষার পদ্মার বানে প্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গে সকল বালকই নৌকা চালাতে শেখে ও জানে, বিনোদও শিখেছিল। এমনি বর্ষাকালে একদিন জিতু ভুঁইয়া জাল হাতে চলল মাছ ধরতে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদকে সাথে নিল নৌকা চালাবার জন্য। জালে ধরা পড়ল একটা বড় শোল মাছ। সেটাকে রাখা হল নৌকার ডরায় (খোলের মধ্যে)। মাছটি তো প্রাণপণে দাপাদাপি, লাফালাফি করতে লাগল। পাছে লাফ দিয়ে জলে প'ড়ে পালায় এই আশঙ্কায়

জিতু বিনোদকে নির্ম্মম আদেশ করছিল—বৈঠার আঘাতে মাছটাকে কাবু করবার জন্য।

বাঁচবার প্রচেষ্টায় মাছটার প্রাণপণ আছাড়ি পিছাড়ি দাপাদাপি দেখে বিনোদের প্রাণ তখন অত্যন্ত করুণার্দ্র ব্যথিত। ওদিকে যমদূতের মত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ। বিনোদ যন্ত্রচালিতের মত বৈঠা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর কিছু করবার সামর্থ্য তার নেই। শুধু করুণ দৃষ্টিতে মাছটার দুর্দ্দশা দেখছে; ব্যথায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে; সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। হঠাৎ মাছটি লাফ মেরে নৌকার উপর দিয়ে জলে গিয়ে পড়ল। বিনোদের বুক থেকে যেন একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল। বিনোদ মহাশান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস বুক ভরে নিল।

এই সামান্য ঘটনার মধ্যেও বালক বিনোদের বিশাল হৃদয়ের জীব-দুঃখ-বিগলিত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

আরো পরের কথা। বিনোদ তখন কৈশোরে পদার্পণ করেছে। বর্ষাকাল, দূর গ্রাম থেকে একজন জেলে এসেছে মাছ ধরতে। সে বাজিতপুরের খালের মধ্যে মাচা বেঁধে ব্যাসালি জাল পেতে মাছ ধরে। কিছুদিন পরে জেলেটি পড়ল কলেরা রোগে। সাথে তার কেউ নেই, কে তাকে দেখবে? সংবাদ পেয়ে ব্যথিত প্রাণে বিনোদ গেল এগিয়ে, সঙ্গিগণ সহায়ে তার চিকিৎসা ও সেবার ভার গ্রহণ করল। কয়েক দিনের সেবায় সে সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে স্বগ্রামে তার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিল।

আর একদিনের কথা। গ্রামের মুসলমান চান্দু হালদার এসে খবর দিল যে মাঠের সীমানায় একটা লোক মরার মত পড়ে আছে। বিনোদ ছুটে গেল কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। একখানা ঢেউ-টিন সংগ্রহ করে তার উপর লোকটিকে শুইয়ে বয়ে নিয়ে এল। তার চিকিৎসা ঔষধপত্র ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করল। সুস্থ হলে ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

"ও কীসের আগুন রে!" ত্রস্ত ব্যাকুল কণ্ঠে একদিন জিজ্ঞসা করল বিনোদ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলাকে। নিশীথ রাত্রিতে খালের তীরে শ্মশান খোলায়

ধ্যানাসনে উপবেশনকালে, দূর মাঠের প্রান্তে গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা ও প্রচণ্ড কোলাহল। ভোলা বলল—"বোধ হয় মুসলমান পাড়ায় আগুন লেগেছে।" ধ্যানাসন ছেড়ে অমনি উঠে পড়ল বিনোদ। ভোলা ও আর কয়েক জন যুবককে সঙ্গে নিয়ে বিনোদ ছুটে চলল মাঠ পেরিয়ে। আগুন ততক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে। দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই জলের জালা নিয়ে বিনোদ একাই জল বয়ে এনে দিতে লাগল, আর কয়েকজনে ধামায় করে তা ছিটোতে লাগল। ঘন্টা খানেক পরে অগ্নিদেবতার লেলিহান রসনা স্তম্ভিত হল। অবিরাম চেষ্টায় আগুন নিভল। উপস্থিত সকলে সাধু ভুঁইয়ার গুণগান করতে লাগল। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সাধু ভুঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

॥ দুই ॥

"দেখ্‌রে কী সর্বনাশ হয়ে গেল! লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়; সর্ব্বস্বান্ত। এ দেখে কি চুপ করে থাকা যায়?" বেদনার্ত্ত চিত্তে ব্যথার সুরে গম্ভীর ভাবে বললেন ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর অনুরক্ত তরুণবৃন্দকে। তারা বলল, "কি করতে হবে?"

"আমাদের সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে এই বিপন্ন দুঃস্থ লোকদের জন্য যথাসাধ্য সেবা সাহায্যের ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি?" ব্রহ্মচারী বুঝালেন কর্ম্মিগণকে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাস। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি জেলা বিধ্বস্ত। লক্ষ লক্ষ নরনারী নিরাশ্রয়, চারিদিকে হাহাকার এমনি দুর্দ্দিনে ব্রহ্মচারী বিনোদের অন্তরের করুণা-বিগলিত বিশ্বনাথ আর্ত্তত্রাণে জেগে উঠলেন। ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর কয়েকজন অনুগত কর্ম্মীর সাথে উপরোক্ত রূপ পরামর্শ করছিলেন।

কর্ম্মীরা হতাশার সুরে বলল, "লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে নিরাশ্রয় নিরন্ন, সেখানে নিঃসম্বল আমরা কী করতে পারি? যেখানে প্রয়োজন প্রচুর অন্ন বস্ত্র অর্থ, সেখানে আমাদের তো নেই একটি কপর্দ্দকও।"

ব্রহ্মচারী উৎসাহ দিয়ে বললেন—"বলিস কি? দেশের লোক অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের অভাবে কাঁদবে, তা দেখে শুনেও আমরা পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে রইব? আমরাও তো মানুষ! মানুষের বিপদে মানুষের প্রাণ কাঁদবে না? দুর্গত

নরনারী-শিশুর সেবা যদি না করি, না করতে পারি, তবে কি আমরা মানুষ?"

কর্ম্মীরা বলল, "দুর্গত মানবের সেবার চেয়ে বড় কাজ কিছু নেই—স্বীকার করি। কিন্তু কী দিয়ে দুর্গতদের সেবা করব—সেইটাই চিন্তার বিষয়।"

ব্রহ্মচারী দৃঢ় কণ্ঠে সঙ্গিগণের প্রাণে উদ্দীপনা সঞ্চার করে বললেন **"ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাব আমরা দ্বারে দ্বারে, সংগ্রহ করব অর্থ-বস্ত্র চাউল। যেখান থেকে যা পাই, তাই দিয়ে আরম্ভ করব নরনারীর সেবাকার্য্য। দুর্গত সেবায় আমাদের অগ্রণী দেখলে, দেখবি দেশের লোক এগিয়ে আসবে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ নিয়ে আমাদের পেছনে।"**

ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে আশা, আশ্বাস উৎসাহ। কর্ম্মীদের প্রাণের সংশয় দূর হল, এল দুর্গত-সেবার উদ্যম। কার্য্যপন্থা স্থির হল। ব্রহ্মচারী দুঃস্থের সেবায় সদলবলে লেগে গেলেন।

ব্রহ্মচারীর আশ্বাসই সত্যে পরিণত হল। কলিকাতায় ও মাদারীপুরে একযোগে **'ইষ্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি'** গঠিত হল। রিলিফ কমিটির অর্থসাহায্যে বহুসংখ্যক কর্ম্মী নিয়ে ব্রহ্মচারী সুচারু ভাবে সেবাকার্য্য পরিচালনা করলেন। দেশের নেতৃবর্গ অনেকে সেদিন তরুণ ব্রহ্মচারীর সংগঠন-শক্তি ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ব্রহ্মচারীর হৃদয়-গুহায় নিরুদ্ধ যে অনন্ত করুণার নির্ঝর মুক্তি প্রতীক্ষায় আকুলি ব্যাকুলি, এবার সেই অমৃত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। কপিল মুনির শাপে বিধ্বস্ত সগর বংশের উদ্ধারের জন্য স্বর্গচ্যুতা পতিতপাবনী জাহ্নবী নেমে এসেছিলেন মর্ত্ত্যধামে। তেমনি ব্রহ্মচারীর বিশাল হৃদয় থেকে নির্গত জীবকরুণার জাহ্নবীধারা এখান থেকে বয়ে চলল দেশে দেশে, সমাজের সকল স্তরের অগণিত নরনারীর তাপিত প্রাণে মনে আশা-আশ্বাস-শান্তি-নির্ভরতার অমৃত-প্রবাহ বহন করে।

॥ তিন ॥

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। মে মাস। খুলনা সহরে ধর্ম্মসভা গৃহে নব প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রম।

"কাল থেকে সকলে দল বেঁধে ভিক্ষায় বেরোতে হবে। টাকা, চাল, কাপড়-চোপড় যে যা দেয়, তাই সংগ্রহ করতে, হবে।"—নির্দ্দেশ দিলেন ব্রহ্মচারী বিনোদ।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় প্রায় সমগ্র অঞ্চলটিতে পর পর কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন বুভুক্ষু নরনারীর দীর্ঘশ্বাসে আকাশ বাতাস মথিত। ব্রহ্মচারী বিনোদের কানে এই দুঃসংবাদ পৌঁছলো। অমনি তাঁর করুণ হৃদয় হল বিগলিত। ত্রস্তচিত্তে এগিয়ে এলেন তিনি দুর্গত জনগণের ত্রাণের সঙ্কল্প নিয়ে। খুলনা সহরের একদল উৎসাহী যুবককে একত্র করে তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবার সঙ্কল্প জানালেন এবং তজ্জন্য আবশ্যক অর্থাদি সংগ্রহের জন্য গৃহে গৃহে ভিক্ষা করার উপরোক্ত প্রস্তাব করলেন। কর্ম্মিদল সানন্দে সম্মত হল।

এমনি ভাবে কপর্দ্দক-ভিক্ষা সম্বল করে সুরু হল ব্রহ্মচারীর আর্ত্তসেবা কার্য্য। কয়েকজন ত্যাগব্রতী উৎসাহী যুবক অগ্রণী হয়ে দুর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গৃহে সাহায্য বিতরণ করতে লাগল।

"একটি লোকও যেন অনাহারে না মারা যায়, এমন ব্যাপক ভাবে সুশৃঙ্খল সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা করা চাই। টাকার জন্য ভাবনা করতে হবে না, টাকা এসে যাবে।"—আশ্বাস দিলেন **মহাপ্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র**।

বিজ্ঞান তপস্বী চিরকুমার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সাতক্ষীরা মহকুমারই অধিবাসী। তাঁর কানে দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্যের সংবাদ যেতেই দরদী প্রাণ নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন ব্রহ্মচারী বিনোদের পেছনে। মণি-কাঞ্চন যোগ হল। **'দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটি'** গঠিত হল প্রফুল্লচন্দ্রের অধিনায়কত্বে। সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সংবাদ সহ সহরে সহরে অর্থসাহায্যের আবেদন প্রচারিত হল। সে আবেদন দেশবাসীর সহৃদয় অন্তরে জাগাল অপূর্ব্ব সাড়া। প্রচুর অর্থাদি সাহায্য আসতে লাগল। সাথে সাথে বিপুল ভাবে সেবাকার্য্যের আয়োজন করা হল। ব্রহ্মচারী বিনোদের রহস্যময় মহাব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত টেনে নিয়ে এল পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত যুবক কর্ম্মী। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবাযজ্ঞে।

অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে ব্রহ্মচারীর অলৌকিক শক্তি তাদের এমনি ভাবে মাতিয়ে তুলল যে তারা নির্ভয়ে সেবাকার্য্যের দায়িত্ব নিয়ে 'নোনা জলের দরিয়া-ঘেরা' "ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীরে"র দেশে স্বচ্ছন্দে দুঃখক্লেশ বরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। বিপদকে বিপদজ্ঞান, ক্লেশকে ক্লেশ-বোধ,—তা যত কঠিনই হোক্— তাদের রইল না। ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দিবারাত্র অসংখ্য মশক-দংশন-জ্বালা, অনাহার, অনিদ্রা কোনো কিছুতেই তাদের উৎসাহ্ দমাতে পারে নি। এমনি ভাবে তারা অনশন মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু নরনারীকে।

ব্রহ্মচারী বিনোদ এখন থেকে ব্যথাহারী বিশ্বনাথের প্রকট রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন দেশের সমাজের সামনে। মঙ্গলময় করে তাঁর বর ও অভয় স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে তাঁর আশ্বাস ও আশীর্ব্বাদের মধুবাণী, নয়নে তাঁর বিশ্বজননীর বাৎসল্য-বিগলিত অমিয় দৃষ্টি; কোটী কোটী পতিত, দলিত, তাপিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সন্তানের ব্যথা-বেদনা জমাট বাঁধা তাঁর বুকে। সেবার পশরা নিয়ে সন্তান-বাহিনী সহ তিনি ছুটে চললেন দেশের সর্বত্র, সমাজের সকল স্তরে, বৎসরের পর বৎসর। আদর করে কোল দিয়ে তিনি মুছিয়ে দিতে লাগলেন তাদের শতেক শতাব্দীর গ্লানি-ম্লানি, জাগিয়ে দিতে লাগলেন সকলের বুকে ভরসার বল, জ্বেলে দিলেন তাদের চোখে আশার অরুণ-আলো, দুঃখে, বিপদে, রোগে, শোকে, অভাবে, অভিযোগে, দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, মহামারীতে, ভূমিকম্পে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তিনি ও তাঁর সঙ্ঘ হল ব্যথার ব্যথী সাথের সাথী, সর্ববিধ সেবা-সহায়তায় ব্রতী।

স্বামী বিবেকানন্দ নবযুগে নব ভাবে যে নরনারায়ণ-সেবার আদর্শ প্রচার করেন (১) ব্রহ্মচারী বিনোদ স্বয়ং পিতা-মাতা, বন্ধু-সখা, সুহৃদ্‌রূপে দেশের ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে, সকল স্তরে, সকল অবস্থায় কোটী কোটী বিপন্ন সন্তানের ত্রাতা, দুর্দিনের বন্ধু, পতিতের উদ্ধারক, নিঃসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিঃসম্বলের, সম্বল, নিরুপায়ের উপায়রূপে জননীর ন্যায় পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেবার সুকোমল হস্ত বাড়িয়ে দিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বয়ে যায়, ব্রহ্মচারী বিনোদের প্রবর্ত্তিত সেবাযজ্ঞ তদীয় সঙ্ঘের বিচিত্র কর্মধারার মাধ্যমে ক্রমশঃ বিরাটতর আকার ধারণ করেছে ও করছে।

॥ চার ॥

"অমন ভাবে সকলের সাথে মিলে মিশে চলা কি উচিত? কাজ নিয়ে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু সময় তাদের সঙ্গে সংশ্রব রাখা, তার বেশী নয়। তোমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলছ, ওদের জীবন তো উদ্দেশ্যহীন! তোমাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চলতে হবে। 'Speciality is chastity'—স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মর্য্যাদা রক্ষাই পবিত্রতা ও মহত্ত্বের পরিপোষক।" —বললেন একদিন ব্রহ্মচারী বিনোদ তদীয় চিহ্নিত সন্তানদের অন্যতমকে।

বহু শত স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মী পূর্ববঙ্গে নানা জেলা থেকে এসে দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্যে যোগদান করেছিল। বিরাট সেবাকার্য্যের জালে ধরা পড়ল ব্রহ্মচারী বিনোদের ভবিষ্য উত্তরসাধক চিহ্নিত অন্তরঙ্গ সন্তানদল। ব্রহ্মচারীর সন্ধানী দিব্যদৃষ্টি শত শত যুবক ও বালকের মধ্যে থেকে চিনে বেছে নিল তাদের।

অবসর সময়ে সুযোগ মত ব্রহ্মচারী তাদের জীবন গঠনের দায়িত্ব সম্বন্ধে উপরোক্ত রূপ উপদেশ দিয়ে সচেতন করে দিতেন। সংসার তাদের ভাল লাগত না। আবাল্য অনুভব করত— যেন তারা অন্য জগতের। সংসার তাদের জন্য নয়, তারাও সংসারের জন্য নয়। তাদের জীবন অন্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট। তাদের জীবন পথও স্বতন্ত্র। কিন্তু কী যে পথ এবং কী যে সে কাজ, তা তারা তখন ঠিক জানতে পারেনি!

ব্রহ্মচারী এই আত্মবিস্মৃত সিংহ-শিশুগণের ভুল ভেঙে দিয়ে নানা ভাবে সস্নেহ উপদেশ দানে তাদেরও ঘনিষ্ঠ করে তুলবার চেষ্টা করতেন। অন্যান্য কর্ম্মীদের সাথে মিশে, তাদের প্রভাবে পড়ে ছিট্‌কে পুনরায় দূরে চলে না যায়, সেদিকে সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

ব্রহ্মচারীর এই চিহ্নিত সন্তানগণও প্রথম দর্শন থেকে আপন জন বোধে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অজ্ঞাত হলেও এ আত্মীয়তার আকর্ষণ দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছিল। তিনি তাদের "**বিবেক বৈরাগ্য-ত্যাগে**"-র অগ্নিবাণীতে উদ্দীপিত

করতেন; "**সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য**" সাধনার পথে জীবন গঠনের উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। কথাপ্রসঙ্গে এমন ইঙ্গিত দিতেন যে তাদের জীবন দ্বারা সর্বনিয়ন্তার বিশেষ উদ্দেশ্য দেশ-সমাজ-জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

* * *

"এমন ব্যাধি বুদ্ধ-শঙ্করের হ'ত; মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও এমনতর ব্যাধি হয়েছিল"—ব্রহ্মচারী মহারাজের মুখে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বাণী। ব্রহ্মচারী মহারাজ তখন রোগশয্যায় শায়িত; যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন। শুশ্রূষারত কয়েকজন অন্তরঙ্গ কর্ম্মী বিস্মিত ও চমকিত।

বিভিন্ন পল্লীতে দুর্ভিক্ষ সেবাকেন্দ্রে কর্মনিরত স্বেচ্ছাসেবকগণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে তাদের মূলকেন্দ্র আশাশুনিতে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ব্রহ্মচারী মহারাজ মাঝে মাঝে পল্লী সেবাকেন্দ্রে গিয়ে সেবাকার্য্য পরিদর্শন করতেন। একবার এক সেবাকেন্দ্রে গিয়ে তিনি নিজেই দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। প্রায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল আশাশুনি মূলকেন্দ্রে। জ্বরের তাপ ১০৭ ডিগ্রী। যন্ত্রণায় তিনি অবিরাম এপাশ ওপাশ করছেন। মাঝে মাঝে মুখে "প্রাণ গেল"—আর্ত্তনাদ।

শুশ্রূষাকারী কর্ম্মীদের মধ্যে এক জনের মনে সংশয় জাগল—ইনি কেমনতর তপস্বী মহাপুরুষ? তপঃশক্তিশালী মহাপুরুষ যাঁরা, ব্যাধিগ্রস্ত হলেও তাঁরা সাধারণ মানুষের মত অস্থির হবেন কেন?

তার অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মত সংশয়ের ঝিলিক জাগতেই কিন্তু ব্রহ্মচারী স্থির, নীরব, নিশ্চল—প্রায় দশ মিনিটকাল। এপাশ ওপাশ করা নেই; আর্ত্তনাদ নেই—পূর্বের মত। তারপর সংশয়ী কর্ম্মীটির মুখের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন—**"এমন ব্যাধি বুদ্ধ-শঙ্করের হ'ত; মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেরও এমনতর ব্যাধি হয়েছিল।"**

তাঁর উক্ত মন্তব্যের মধ্যে কর্ম্মীটি পেলেন ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দুটি ইঙ্গিত। **প্রথম—তিনি অন্তর্য্যামী; দ্বিতীয়—তিনি বুদ্ধ-শঙ্কর চৈতন্যের সমকক্ষ মহাপুরুষ।**

এমনি আরও নানাভাবে, কর্ম্মিগণের অন্তরের অনেক কিছুই যে তিনি জানেন, তা তাঁর আলাপ, আচরণের ও উপদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। তাতে চিহ্নিত কর্ম্মিগণের মনে তাঁর মহত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা ক্রমশঃ উচ্চতর হতে লাগল।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ এক ॥

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারী মাস, মাঘী পূর্ণিমা। বাজিতপুর পল্লীপ্রান্তে নিবিড় অরণ্যখণ্ডের ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যাওড়া-বৃক্ষ-কুঞ্জের অন্তরালে ব্রহ্মচারীর আশ্রম কুটীর। কুটীর মাঝে নিস্তব্ধ নিশীথে ঠাকুর ঘরের প্রকোষ্ঠে প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডের চারিপাশে সমাসীন একদল কিশোর ও যুবক। হৃদয়ে তাদের বৈরাগ্যের বহ্নিদীপ্ত; আরক্তিম তাদের মুখমণ্ডল হোমাগ্নির উজ্জ্বল আভায়; ললাটে অঙ্কিত পবিত্র যজ্ঞতিলক; মুণ্ডিত মস্তকে শিখাগুচ্ছ; স্কন্ধে ও বক্ষে প্রলম্বিত ব্রহ্মসূত্র; স্থির গম্ভীর শান্ত সমাহিত।

অকস্মাৎ সেই তরুণদলের সমুজ্জ্বল ললাটপটে ফুটে উঠল সুদৃঢ় সঙ্কল্পরেখা; সম্বন্ধ ওষ্ঠাধরে মৃদু কম্পন; আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে তাদের প্রতিজ্ঞার ঋক্‌মন্ত্রের ঝঙ্কার ঃ—

১। সন্ন্যাস বা ত্যাগরূপ যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিলাম, জীবনে তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

২। আত্মতত্ত্বোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই ত্যাগীর বেশ পরিত্যাগ বা সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিনিষেধ কদাচ লঙ্ঘন করিব না।

৩। রিপু ও ইন্দ্রিয়কে কদাপি প্রশ্রয় দিব না।

৪। সতত সত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্যস্বরূপ সনাতন পুরুষকে লাভ করিবার চেষ্টা করিব।

৫। চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া সমগ্র জীবন যাপন করিব।

এ তরুণ সাধকের দল কারা? কেন তাদের এ দুশ্চর ব্রতবরণ? কী তাদের উদ্দেশ্য?

খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য্য সমাপ্ত হয়েছে। যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর প্রাণপাতী সেবায় লক্ষ লক্ষ নরনারী মরণের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেল, সেই কর্ম্মিদল কার্য্যান্তে ফিরে গেছে স্বস্থানে স্বগৃহে।

কিন্তু তার মধ্যে যারা ছিল ব্রহ্মচারী বিনোদের ভবিষ্য জাতিগঠনমূলক ধর্ম্মচক্র ও কর্ম্মচক্রের উত্তরসাধক, সেই চিহ্নিত যুবক ও কিশোর সন্তানদল গৃহ-সংসারে ফিরে গেল না। তাদের প্রাণের তারে ব্রহ্মচারীর দিব্য স্পর্শে জেগেছে অনন্তের অমৃতের সঙ্গীত। অন্তরে তাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের অনলদীপ্তি, হৃদয়ে তাদের মহামুক্তির পিপাসা; সংসারনেশার স্পর্শ বিন্দুমাত্র লাগেনি তাদের তরুণ প্রাণে। তারা ব্রহ্মচারী বিনোদকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে রইল আশ্রমে ও স্থায়ী সেবাকেন্দ্রে, বিবিধ সমাজসেবা ও পল্লী-উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব নিয়ে।

ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠে মাঘী পূর্ণিমার মহোৎসব আসন্ন। উৎসবানন্দে যোগদানের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সকলে সমবেত "বাজিতপুর সেবাশ্রমে।" সকলেরই প্রাণে আনন্দের উচ্ছ্বাস। দিব্য মধুর পবিত্র জীবনের দুয়ার তাদের সামনে উন্মুক্ত। অপূর্ব পুলকাবেগে তারা আত্মহারা। তাদের মনেরও অজ্ঞাতে প্রাণে বিশ্বাস ও অনুভূতি জেগেছে যে ব্রহ্মচারী মহারাজই তাদের দিব্যরাজ্যের দিশারী। সকলে সঙ্কল্প নিল—ব্রহ্মচারী মহারাজের চরণে ত্যাগব্রত বরণ করে "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"— আত্মতত্ত্বোপলব্ধি এবং জগতের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করে প্রাণভরে মহামুক্তির অমৃত পাণ করবে।

এই মহাপুণ্যা তিথি মাঘী পূর্ণিমার শুভলগ্নে তরুণ ত্যাগী সাধক সন্তানদল ব্রহ্মচারী মহারাজের মহাসিদ্ধপীঠের নিভৃত নিলয়ে তদীয় মহাতপঃসিদ্ধির শুভলগ্নে সমুপস্থিত। ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বীয় কুটীরে সমাধিমগ্ন। এমনি নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে যজ্ঞাগ্নিতে দেবতাগণকে ও দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করে তরুণ তাপসগণের উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ ও ব্রতবরণ। অতঃপর মহোচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থিত ব্রহ্মচারী মহারাজ একে একে সন্তানগণকে ত্যাগবস্ত্র

(কৌপীন ও বহির্বাস) দান পূর্বক অভয় আশীর্ব্বাদের অমৃতবারিতে অভিসিঞ্চিত করলেন। সন্তানগণ আনন্দের আবেগে অনুভব করল যেন তারা নব যুগের নবীন "আনন্দমঠে"র সংশপ্তক সন্তানদল। অন্তরে তাদের দিব্য অনুভূতি জাগল—"সংসারবাসনার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত আমরা অসীম আকাশে পক্ষ বিস্তার করে চলেছি, বাধাবন্ধহীন, ভাবনালেশহীন, জ্বালা-মালা-বিরহিত জীবনে মহামুক্তির নিঃশ্বাস প্রাণভরে নিচ্ছি।" ব্রহ্মচর্য্য সাধনার মহাবাণী তাদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত ঃ—

"সন্ন্যাস বা ত্যাগরূপ মহাব্রত গ্রহণের নিমেষ পূর্বে যে 'আমি' ছিলাম, এখন আর সে 'আমি' নই। কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনির্বাণ ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগস্পৃহাকে নষ্ট করিয়া নব ভাবে নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি মহামুক্তি-পথের পথিক।"

"আমি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিকে সাক্ষী করিয়া অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া যে মন্ত্র গ্রহণ করিলাম, এ জীবনে তাহা কোনো ক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এই ব্রত পালনের জন্য আমাকে যে-কোনো দুঃখ-দৈন্য সানন্দে সাগ্রহে বরণ করিতে হইবে। আম বহু জন্মের সুকৃতি ও সৌভাগ্যবশে ত্যাগধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। মায়া-মোহ, পাপ-তাপ, ভ্রম-ভ্রান্তি, আমার জন্য নয়। আমি নিজে জাগিয়া দেশকে জাগাইব, আমি নিজে উঠিয়া দেশকে উঠাইব। আমি বিপুল বিক্রম ও প্রবল পরাক্রম সহকারে বৈরাগরূপ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেশকে মহাধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহাসংগ্রাম ক্ষেত্রে স্বীয় অস্তিত্ব ও বিশেষত্বের পরিচয় দিব।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য শুভক্ষণে জগৎ-কল্যাণ-কল্পে মহাসিদ্ধপীঠে সমাহিত ব্রহ্মচারী মহারাজের মহাব্যক্তিত্বের মাধ্যমে "মহাসঙঘ" প্রতিষ্ঠার যে ভাগবত সঙ্কল্প বীজরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় সে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম—একদল সর্বত্যাগী তরুণ তপস্বীর স্ফুটনোন্মুখ জীবনকুসুমের আত্মনিবেদন ও আত্মবলিদানে।

॥ দুই ॥

ত্যাগব্রতে দীক্ষিত তরুণ তাপসগণের জীবনসাধনার দুইটি ধারা বয়ে চলল পাশাপাশি। একটি আত্মজীবন শোধন ও আত্মজীবন গঠন; অপরটি জীবজগতের সেবাব্রত।

সন্তানগণের প্রাণে মনে বিবেক বিচার—"কীসের সংসার? কীসের গৃহদ্বার, আত্মীয় পরিজন? কীসের জীবন? মৃত্যু তো যে কোনো মুহূর্ত্তে আমাকে গ্রাস করতে পারে; তখন এই দেহ চিতাশয্যায় দগ্ধ হয়ে একমুঠো ছাই হয়ে দাঁড়াবে। তবে এই দুঃখ কষ্ট রোগ শোক জ্বালামালার জীবনে কি লাভ? জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য কী? সেই উদ্দেশ্যের পথে না চ'লে এমন ভাবে দিশাহারা হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রপথে ঘুরে মরব কেন?"

"আমি তো দেহ নই, দেহের মরণে আমার মৃত্যু হয় না। আমি 'আত্মা'। অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয় আমি। ইহাই তো শাস্ত্রের অভ্রান্ত বাণী, মহাপুরুষগণের উপলব্ধি। আমি চাই—আত্মস্বরূপ জেনে জন্ম-মৃত্যু-রোগ-শোক জয় করে অমৃতত্ব লাভ করতে।"

"ত্যাগের পথে শান্তি, আর ভোগের পথে অশান্তি। তাই তো জীবজগতের সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করেছি। চারিদিকে দুঃখ-দুর্দ্দশা, অশান্তির-হাহাকার। দুঃখের আগুনে জ্বলছে মানব সমাজ, লক্ষ্য-আদর্শ-উদ্দেশ্য হারিয়ে, কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ দিশেহারা। তাই "কাময়ে দুখতপ্তানাং প্রাণিনাং আর্ত্তিনাশনম্"—আর কী চাইব? এই দুঃখ-তাপদগ্ধ জীবকুলের দুঃখহরণই প্রাণের ঐকান্তিক কামনা; তাই জীব-জগতের সেবায় উৎসর্গ করে এ জীবন সার্থক।"

আহার নিদ্রা-বিশ্রাম যথাসম্ভব কমিয়ে সমগ্র দিনমান ও রাত্রির কিয়দংশ কাটত সহরে ও গ্রামে নানাপ্রকার জনসেবার ও আশ্রম সংক্রান্ত কার্য্যে। আর রাত্রির অধিকাংশ কাটত জপধ্যান ও বিবেকবিচারে। এরই মধ্যে চলত যথাসময়ে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদির পাঠ ও আলোচনা।

এমনিভাবে সুরু হল তরুণ সন্তানগণের **"আত্মনো মোক্ষার্থং"** এবং **"জগদ্ধিতায়"**—নিজের মুক্তি ও জীবজগতের সেবার সাধনা ও তপস্যা।

॥ তিন ॥

"মশায় আপনারা কি পাগল হয়েছেন? দেশটাকে কি দশ হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান? ও সব প্রাচীন ঋষিযুগের কথা ছেড়ে দিন। দেশ চলেছে এগিয়ে দ্রুত গতিতে। এটা রাজনীতির যুগ! দেখছেন না—রাজনীতির আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতকে কী ভাবে মাতিয়ে তুলেছেন। আপনারা আসুন, আমাদের সাথে এই "অহিংস অসহযোগ" আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

১৯২২ খৃষ্টাব্দ। তখন গান্ধী প্রবর্ত্তিত "অহিংস অসহযোগ" আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সমগ্র ভারত আলোড়িত। আদালত ছেড়ে উকীলরা, স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্ররা বেরিয়ে পড়েছে; চাকুরিয়ারা চাকুরীতে ইস্তফা দিচ্ছে। দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারাগার বরণ করছে।

এমনি সময়ে তরুণ ব্রহ্মচারীরা যখন ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ও বাণী নিয়ে জনসাধারণের নিকট প্রচারে যেতেন, তখন তাঁদের প্রায় সর্বত্রই উপরোক্তরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে হতবাক্ হতে হত। তখন তাঁদের মানসিক বিকাশ ও গঠন তেমন কিছু হয়নি। সুতরাং, সংশয়ী জনগণকে বুঝিয়ে নিরস্ত করবার মত ক্ষমতাও তাঁদের হয়নি। তাই এমনি ভাবে নানাস্থানে নানাজনের প্রশ্নবাণে নিরুত্তর হয়ে তাঁরা বিষণ্ণ মনে ফিরে আসতো।

পরিশেষে একদিন তাঁরা তাঁদের নেতা আচার্য্য ব্রহ্মচারী বিনোদের নিকট মনোব্যথা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ দেখলেন যে তাঁর সন্তানগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ, অবসন্ন, নিরুৎসাহ। সন্তানগণের প্রাণে উৎসাহের অগ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত করে দিয়ে তিনি হুঙ্কার দিলেন—"**এ দেশ, এ সমাজ, এ জাতির সমস্যা জানে বোঝে কে, ক'জন? যে মন কামনা-বাসনার জ্বালায় জর্জ্জরিত, যে মন, যে বুদ্ধি, রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তাড়িত যে মন, যে বুদ্ধি স্বার্থের নরককুণ্ডে লুণ্ঠিত, সেই মন, সেই বুদ্ধি দিয়ে কি দেশ-জাতি-সমাজের সমস্যার সমাধান চলে? যদি ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাল্মীকির মত ত্রিকালজ্ঞ ঋষি থাকেন, যদি বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের ন্যায় সর্বত্যাগী সিদ্ধসমাহিত মহাপুরুষ থাকেন, তবে তিনিই বুঝবেন—আমি তোমাদের যে পথ দেখাচ্ছি, এ ছাড়া**

অন্য কোন পথ নেই। মহাত্মা গান্ধীকে আজ দেশ মাথায় করে নাচ্ছে; এমন দিন আসছে, তোমরাই দেখবে, তাঁকে দূরে ছুড়ে ফেলে দেবে। তোমরা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রদর্শিত পথে চলো, দেশ-জাতি-সমাজ তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।"

আচার্যের অগ্নিবর্ষী বাণীপ্রবাহে সন্তানগণের অন্তরের সঞ্চিত সংশয়ের মেঘ স'রে গেল। তাঁরা মহোৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চললেন হস্তে সেবার উপচার, মুখে ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের বাণী; আহার বিহার বেশভূষায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি তাঁরা।

সন্তানগণ বুঝল—ব্রহ্মচারী মহারাজ নিজস্ব মানসিক খেয়ালে দেশ-জাতি-সমাজের সেবা কল্যাণের পথ নেন নি। মহাতপঃ সাধনার ফলে তদীয় প্রজ্ঞাদর্পণে দেশ, জাতি ও সমাজের ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ফুটে উঠেছে। দেশের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের গৃহীত মত ও পথের অসারতা তিনি দেখেছেন। তাঁর দেহ, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বনাথের বিধান রূপায়িত হতে চলেছে। আর একদিন তিনি সন্তানগণকে বলেছিলেন—**"আমি কি কাউকে চাই? আমার উপর সর্ব্বনিয়ন্তার যে প্রত্যাদেশ, মাটীর পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ক'রে, আমি তা করে যাব।"**

এর পর ব্রহ্মচারী মহারাজের নেতৃত্বের উপর সন্তানদের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতা দৃঢ়মূল হল।

॥ চার ॥

"সন্ন্যাসীর জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে, তোমাদের ন্যায় কতক সন্ন্যাসীকে জীবজগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থে ব্যয় করিতে হইবে।"

"তোমাদিগকে ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্ত্তি হইতে হইবে। তোমরা সনাতন আদর্শে গঠিত হইয়া আর্য্য ঋষিদের আসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই অধঃপতিত দেশকে নীতি ও ধর্মের পথে পরিচালিত করিবে (সঙ্ঘগীতা)।" এই মহান্ বাণীমন্ত্রে ও

কর্ত্তব্যনির্দ্দেশে তরুণ সন্ন্যাসী সন্তানগণকে অনুপ্রাণিত করলেন আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী—প্রয়াগ ধামে অর্দ্ধকুম্ভমেলা। ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রয়াগধামে পুণ্য ত্রিবেণীসঙ্গমে শুভলগ্নে সন্ন্যাস গ্রহণ করে—আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ নামে দেশ ও জাতির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তৎপরে ফেব্রুয়ারী মাসে পুণ্যা মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বাজিতপুরে তদীয় তপঃসিদ্ধির মহাসিদ্ধপীঠে এই তরুণ ব্রহ্মচারী সন্তানদলকে সন্ন্যাস সংস্কারে সংস্কৃত করে নবযুগে সন্ন্যাসের নব আদর্শে নবমন্ত্রে দীক্ষাদান পূর্বক **'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের'** ভিত্তি পত্তন করলেন। তরুণ ব্রহ্মচারী সন্তানরা ইতোমধ্যে পূর্বাশ্রমের (গৃহাশ্রমের) স্মৃতি ও সংস্কার ভুলেছেন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহাভাব ও আচরণ উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁদের জীবনে। এবার সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁদের সামনে উচ্চতর জীবনের দ্বার খুলে দিল। দেশ, সমাজ, ও জাতি তথা জীব-জগতের সেবার পবিত্র মহান্ ব্রতে আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্পে সিদ্ধ হলেন তাঁরা।

তরুণ সন্ন্যাসীরা অনুভব করলেন—ভারতের প্রাচীন ত্যাগ-সংযম-সত্য-ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বিলুপ্ত। সন্ন্যাসের আদর্শ ও সাধনাকে যুগের উপযোগী নূতন আদর্শ, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। সেই আদর্শকে নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলে জাতি ও সমাজের সামনে ধরে দেওয়া প্রয়োজন।

সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবরূপী শিবের, নররূপী নারায়ণের সেবায়, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা। ভারতের বর্ত্তমান সাধু-সন্ন্যাসীরা সেই আদর্শ ও ব্রত থেকে বিচ্যুত। কল্পিত আত্মমুক্তির ভ্রান্তিতে মগ্ন। এই ভ্রান্তি ঘুচিয়ে দিতে হবে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ত্যাগী, তপস্বী, সাধু ও সন্ন্যাসীরাই ছিলেন ভারতীয় জাতির শিক্ষাদীক্ষাদাতা। শুধু তাই নয়, তাঁরাই ছিলেন—সমাজের সংগঠক, জাতির নায়ক, রাষ্ট্রনিয়ামক। রাজা ও প্রজা সকলেরই মাথা ছিল তাঁদের পায়ে শ্রদ্ধা ভক্তিতে নত।

সংঘের সন্ন্যাসী-সন্তানগণকে আচার্য্য বুঝালেন—"সংসার সমাজ থেকে দূরে নির্জ্জন গিরিগুহায় বসে তপস্যা না করিলে আত্মজ্ঞান বা মুক্তি হইবে না—এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। সমাহিত মনই নির্জ্জন গিরিগুহা।' তৎপর নির্দ্দেশ—'আত্মমুক্তির ভ্রান্ত ধারণা পরিহার কর। তোমাদের লক্ষ্য দেশ, জাতি ও সমাজের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি। "তোমাদের জীবন দিয়ে সন্ন্যাসের নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা চাই। "তোমাদের ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের জলন্ত জীবন্ত জীবন নিয়ে দেশ ও সমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে। দেশ, সমাজ ও জাতির সেবায় তোমাদের জীবন বলি দিতে হবে।'

"নিয়ন্তার শুভ আশীর্ব্বাদে ধন্য জন্ম তোমা সবাকার।
খুলে দিনু নিজ হাতে তাই সন্ন্যাসের মহামুক্তিদ্বার।
জগতের কল্যাণ সাধনে মানবের মহামুক্তি তরে।
তোমাদের জীবন সাধনা অমৃত বিলাবে ঘরে ঘরে।
ভারতের মহামলিনতা ঘুচাইতে তোদের জনম।
জীবন ভরিয়া হবে তাই রক্তবিন্দু করিতে মোক্ষণ।"

পঞ্চম অধ্যায়

॥ এক ॥

তীর্থসংস্কার হবে আমার ভবিষ্য সঙ্ঘ-কর্মচক্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ"—সঙ্কল্প জেগেছিল সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের (ব্রহ্মচারী বিনোদ) প্রাণে।

তখনো তিনি সন্ন্যাস নেন নি। একদা গোরক্ষপুর যাওয়ার পথে তিনি গয়াধামে রেল ষ্টেশনে অবতরণ করে দেখলেন—দুর্দ্দান্ত পাণ্ডাদের হাতে কতকগুলি নিরীহ যাত্রীর লাঞ্ছনা। প্রতিকার করতে এগিয়ে গেলেন তিনি। ব্রহ্মচারীর বিশাল বলিষ্ঠ দেহ এবং তেজোদীপ্ত রুদ্রমূর্ত্তি দেখে পাণ্ডারা সভয়ে যাত্রীদের ছেড়ে দিল। কিন্তু সেইদিন থেকে ব্রহ্মচারীর মানসনয়নে অহরহঃ জেগে রইল—হিন্দুতীর্থ সমূহের

অনাচারের জ্বলন্ত চিত্র; আর কাঁটার মত বিঁধে রইলো তাঁর করুণা-কাতর অন্তরে অসহায় তীর্থযাত্রীদের দুরবস্থা ও ব্যথা-বেদনার চিত্র।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। গয়ালী পাণ্ডার অত্যাচার উঠেছিল চরমে। জনৈকা অসহায়া বাঙ্গালী যাত্রিণীকে অত্যাচারপূর্বক নিহত করেছিল পাণ্ডারা। ভীষণ চাঞ্চল্য। গয়ার বেঙ্গলী সেট্‌লার্স অ্যাসোসিশেনের (Bengalee Settlers Association) সভাপতি সংবাদপত্রে গয়ালী পাণ্ডার এই নৃশংস কাণ্ডের বিবরণ প্রকাশপূর্ব্বক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট এই অত্যাচারের আবেদন জানালেন।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ (ব্রহ্মচারী বিনোদের সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম) আবেদনে সাড়া দিলেন। তাঁর অন্তরের চিরপোষিত সঙ্কল্প কাজে পরিণত করবার সুযোগ এসে গেল। কর্ম্মিগণ সহ অতি দ্রুত তিনি গয়াধামে উপনীত হলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ও পরামর্শক্রমে কর্মব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলেন।

*　　　*　　　*

বিরোধের পথে নয়, দ্বন্দ্ব-বিসংবাদের পথে নয়; আবেদন নিবেদনের পথেও নয়। তিনি নিলেন যাত্রিগণের সেবা ও তত্বাবধানের নির্বিরোধ পন্থা। বাড়ী ভাড়া করে যাত্রীদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা হল, আর একটি বাড়ীতে স্থাপিত হল দাতব্য চিকিৎসালয়, অসুস্থ যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য। প্রত্যেক যাত্রী যাতে নিজস্ব পাণ্ডার দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পব্যয়ে তীর্থকৃত্য করবার সুযোগ পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করা হল। অত্যাচার, জুলুমবাজি, পীড়নপূর্ব্বক অর্থাদায় যাতে না হতে পারে, তজ্জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা রইলো।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই আশাতীত সুফল ফললো। সঙ্ঘের তীর্থযাত্রী সেবাকার্য্যের প্রতি সহৃদয় দেশবাসীগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হল কাশীধামে, পুরীধামে এবং প্রয়াগধামেও অনুরূপ তীর্থসেবাকেন্দ্র ও যাত্রিনিবাস স্থাপিত হল। দানশীল ধনী ব্যক্তিগণ তাঁদের অর্থভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে এলেন সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতা করতে। তাঁদের অকুণ্ঠ দানে অল্পকালের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ যাত্রিনিবাস গড়ে উঠলো।

কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠলো সঙ্ঘের অজস্র

সুখ্যাতিবাদে। তীর্থে তীর্থে তীর্থগুরু পাণ্ডাদের টনক নড়লো। বুঝলো তারা—ভারতের হিন্দু জনগণ আজ জাগ্রত; তাদের সমবেত সমর্থন সঙ্ঘের পশ্চাতে। সাবধান হয়ে গেল তারা। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বল্‌তে শোনা গেল—"অন্য সব কথা বাদ দিলেও এই একটিমাত্র কাজই স্বামী প্রণবানন্দকে হিন্দুজাতির চিরনমস্য ও চিরস্মরণীয় করে রাখতে যথেষ্ট।"

কিন্তু জগতে সৎ ও শুভকাজের পক্ষে বাধা অনেক। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" সঙ্ঘের তীর্থসংস্কার কর্মপন্থা নির্বিরোধ হলেও কিন্তু পর পর ছোটবড় বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কায়েমী স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটবার আশঙ্কায় একদল পাণ্ডা নানাসূত্রে শত্রুতা সাধনের প্রয়াস পেয়েছিল। সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় সঙ্ঘের যাত্রিনিবাসগুলিকে 'সরাইখানা আইনে'র (Sarai Act) কঠোর নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। যাত্রী সহ সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি অত্যাচারও চলেছিল। পাণ্ডাগণ একজোট হয়ে সঙ্ঘের যাত্রিনিবাসে আশ্রয়প্রাপ্ত যাত্রীদের পিণ্ডদান বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল—ইং ১৯৩৭ সালে। কিন্তু এই দুর্বুদ্ধির প্রতিফলও তারা হাতে হাতে পেয়েছিল।

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে বঙ্গদেশে সংবাদপত্রে, সভা-সমিতিতে পাণ্ডাদের অত্যাচার ও জুলুম-বাজির বিবরণ প্রকাশিত ও আলোচিত হতে লাগলো। ফলে হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে জাগলো পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যাত্রিগণ আর পাণ্ডাদের কাছে যেতে সম্মত নয়। পাণ্ডাদের বাদ দিয়েই পুলিশ প্রহরায় পুরোহিত দ্বারা যাত্রীদের শ্রাদ্ধপিণ্ডকার্য্যাদি সমাধা করা হতে থাক্‌লো। পাণ্ডারা জব্দ হল।

তারা অবশেষে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের শরণাপন্ন হয়ে নিবেদন করলো—মহারাজ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি যেরূপ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দেবেন, আমরা তাতেই রাজী।

আচার্য্যদেব তাদের আশ্বাস দিলেন—"পাণ্ডাদের জীবিকা-বৃত্তি নষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বহু শতাব্দী যাবৎ পাণ্ডারাই তীর্থের গুরু ও তীর্থস্থানের রক্ষক। ধর্মপ্রাণ হিন্দু যাত্রীরা তাদের সেই দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তাই পাণ্ডাদের দুর্নাম

যাতে দূরীভূত হয়, তীর্থযাত্রার নামে যাত্রীদের প্রাণে যাতে আতঙ্ক না আসে, নিরাপদে স্বচ্ছন্দে যাতে তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই আমার তীর্থ সংস্কার আন্দোলন ও কার্য্যাবলী।

তীর্থের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে অধিক সংখ্যক যাত্রী তীর্থে আসবে, পাণ্ডাদের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়বে। তাতে পাণ্ডাদের জীবিকাবৃত্তির উৎকর্ষ হবে। আমি তীর্থগুরু পাণ্ডাদের বিরোধী নই, আমি যথার্থতঃ তাদের হিতৈষী। **শত শত বর্ষ যাবৎ তীর্থে তীর্থে যে অনাচারের কলুষ কালিমা ও কলঙ্ক জমেছে, তার বিরুদ্ধেই আমার অভিযান, পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে নয়।"**

এই সময়ে তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছিল। কেউ কেউ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট প্রস্তাব করেছিল যে স্বামী প্রণবানন্দকে সেই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান করা হোক। কিন্তু দূরদর্শী চিত্তরঞ্জন নিষেধ করে বলেছিলেন—আমাদের এটা সাময়িক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গরূপে। এর মধ্যে তাঁকে (স্বামী প্রণবানন্দকে) জড়ানো সমীচীন নয়। তিনি চলেছেন ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবার পথে। তাঁর কাজ ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী। তাঁকে তাঁর পথে স্বচ্ছন্দে চলতে দাও।

কালক্রমে সঙ্ঘের তীর্থসংস্কার কার্য্য কেবলমাত্র যাত্রিসেবার মধ্যেই সীমিত রইলো না। তীর্থক্ষেত্রগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে দেশ ও জাতির মিলনকেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র, প্রচারকেন্দ্র ও সংগঠনকেন্দ্র। যুগে যুগে যখনি কোন জাতিসংগঠক ও ধর্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, তখন এই তীর্থগুলিকেই তিনি কর্মকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করেছেন।

সঙ্ঘের তীর্থসেবাশ্রমগুলিকে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য ক্রমশঃ ধর্ম প্রচারকেন্দ্র ও জাতিসংগঠনকেন্দ্রে পরিণত করলেন। তার মাধ্যমে ভারতের সর্বত্র সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়লো সঙ্ঘের আদর্শ, ভাব, বাণী ও সাধনার ধারা। সঙ্ঘের তীর্থসেবাশ্রমের মিলনকেন্দ্রে সকলের সমান মর্য্যাদা;এখানে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উন্নত ও অনুন্নত, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য, সমাজের উচ্চতম থেকে নিম্নতম ব্যক্তি পর্যন্ত মহামিলনের মহাভাবে একাকার। এমনি ভাবে তীর্থের অতীত মহিমা

সঙেঘর তীর্থসংস্কার কার্য্যের মাধ্যমে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জগদ্‌গুরু আচার্য্যের মহাতপঃশক্তির স্পর্শে তীর্থগুলিতে, অভিনব প্রাণস্পন্দন জাগ্রত হয়েছে।

সঙঘনেতার আদেশ ও নির্দেশ শিরে ধারণপূর্বক সঙেঘর প্রচারক সন্তানবাহিনী বেরিয়ে পড়লো তীর্থগুলিতে যাত্রিগণের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ধর্মভাবের পরিবেশ-সৃষ্টি এবং সনাতন ধর্মের আদর্শ—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। হরিদ্বার, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভমহামেলায়, পুরীধামে রথযাত্রামেলায়, কাশীধামে অন্নকুট মেলায়, শোনপুরে হরিহরছত্র মেলায়, গয়াধামে পিতৃপক্ষমেলায়, নানাবিধ সেবাকার্য্য ধর্মানুষ্ঠান ও সম্মেলনাদির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী প্রাণে প্রাণে অনুভব করলো ধর্মের জীবন্ত প্রাণপ্রবাহ। এইরূপে প্রস্তুত হলো সঙঘনেতার অভীষ্ট ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠন পরিকল্পনার ভূমিকা।

॥ দুই ॥

"আপনি তো বেশ দেশের কাজ করছিলেন। দুঃস্থ দুর্গত নরনারায়ণের সেবাব্রত নিয়ে চলছিলেন। শতমুখে আপনার গুণগান শুনে আমরাও গৌরব বোধ করতাম। কিন্তু এ আবার কী কাণ্ড! গুরুগিরির ভূত পেয়ে বসলো কেন? পূজোর আসনে বসে হাজার হাজার নরনারীর দ্বারা পা পূজো করাচ্ছেন কেন? এমনতর মতিভ্রম কেন হলো?"

১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দ। সঙঘনেতা আচার্য্য ভগবদাবেশে জগদ্-গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত। মহাসমারোহে চারিদিকে গুরুপূজার আন্দোলন। সঙেঘর আশ্রমগুলিতেই শুধু নয়, দেশের সর্বত্র শহরে ও গ্রামে, তীর্থস্থানে ও ধর্মমহামেলাতে, সহস্র সহস্র জনসমাগমে ত্রিসন্ধ্যা গুরুপূজা ও আরতির অনুষ্ঠান চলছে—সঙঘনেতা আচার্য্যকে কেন্দ্র করে।

শিক্ষিত জনগণ এতে বিরক্ত ও রুষ্ট; বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠ নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর সঙেঘর হিতৈষী বন্ধুরাও অনেকে হলেন শত্রু।

একদিন কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপরোক্ত অভিযোগ নিয়ে হলেন আচার্য্যের সম্মুখীন। কণ্ঠে তাঁদের অবজ্ঞার সুর, মুখে বিদ্রূপের ভাষা, অন্তরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ।

আচার্য্য স্থির গম্ভীর; শুনলেন তাঁদের অভিযোগ; প্রসন্ন মধুর হাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল হলো উজ্জ্বল। সুস্নিগ্ধ কণ্ঠে আশাভরসা ও সান্ত্বনার সুর ঢেলে আচার্য্য বললেন—"চেয়ে দেখুন একবার আপনাদের সমাজ, পরিবার ও সংসারের দিকে, সেখানে আজ আছে কি? পিতামাতার প্রতি সেবাভক্তির ভাব আছে কি? ভ্রাতৃভক্তি ও প্রীতি আছে কি? আছে কি পতি-পত্নীতে ভক্তি, প্রেম, আনুরক্তি ও সেবার সম্বন্ধ? শিক্ষক ও ছাত্রে পরস্পর ভক্তি, স্নেহ, সেবা, বিনয় ও আজ্ঞাবহতার ভাব আছে কি? সমাজে জনগণের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধা সৌজন্য, কৃতজ্ঞতা, সহানুভূতি, প্রীতি, সহায়তা ও সহযোগিতার ভাব আছে কি? সমাজ আজ কর্ণধারবিহীন তরণী, অরাজক রাজ্য ছাড়া আর কী? উচ্ছৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা, ঔদ্ধত্য, অনাচার, আত্মসুখসর্বস্বতা সমাজের সর্বাঙ্গে সর্বস্তরে। এমনতর সমাজে সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও উন্নতি কীরূপে সম্ভব?"

বর্ত্তমান যুগের পারিবারিক ও সামাজিক দুর্গতি ও দুর্নীতির চিত্র সামনে ধরে দিয়ে আচার্য্য বুঝালেন—"**আমি চাই ভারতের অতীত পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ফিরিয়ে আনতে, যাতে হবে সমাজজীবন সুস্থ, স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময়। তার জন্যই আমার ভারতব্যাপী গুরুপূজার আন্দোলন।**

আচার্য্য পরিষ্কার করে বললেন—"আমার গুরুপূজা গুরুভক্তি ও গুরুসেবার আন্দোলন সমাজের সকল স্তরে, সংসারে, পরিবারে আনবে—শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম, প্রীতি, সৌজন্য, সহানুভূতি ও সেবার ভাবের প্লাবন, তাতে ধুয়ে মুছে যাবে হাজার বছরের পরাধীনতা ও পরানুকরণের অভিশাপ—অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার মালিন্য, ফিরে আসবে পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভাই-ভাই, শিক্ষক-ছাত্র, প্রভু-ভৃত্য, নেতা-জনতা—সকলের মধ্যে পরস্পর যথাযোগ্য স্নেহ-ভক্তি, প্রেম-প্রীতি, সেবা-সহানুভূতি, সৌজন্য-শিষ্টাচার, বিনয়-আজ্ঞাবহতার

ভাব ও সম্বন্ধ। সমাজজীবনে আসবে শৃঙ্খলা, নীতিপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেবা ও সহযোগিতার ভাব।"

আচার্য্যের যুক্তিযুক্ত সমাজকল্যাণকর উদ্দেশ্য জেনে অভিযোগকারী ব্যক্তিগণের ভাবের পরিবর্ত্তন হল। বিরক্তি, ক্ষোভ ও অবজ্ঞার বদলে জাগ্রত হলো গভীর বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব। তাঁরা আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—গুরুপূজার উদ্দেশ্য যদি এমনি মহৎ ও সমাজ-কল্যাণকর হয়, তবে তা মণ্ডপে স্বল্পসংখ্যক জনগণের মধ্যে সীমিত রাখা কেন? বিরাট আকারে লক্ষ লক্ষ জন সমাগমে করা উচিত! সানন্দ, সশ্রদ্ধ, নিশ্চিত মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন।

"আপনি করছেন কী? যাদের নিয়ে আমরা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাই, দেশের স্বাধীনতার সাধনায় যারা আমাদের সম্বল, সেই তেজস্বী তরুণগণকে গুরুভজা বৈরাগী বানাচ্ছেন! দেশের সর্বনাশ করতে বসেছেন না কি?"

ক্ষোভে অসন্তোষে ফেটে পড়লেন আচার্য্যের কাছে এসে একদিন অন্যতম বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৯২৭-২৮ সাল। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য তখন আর একটি আন্দোলনে হাত দিয়েছেন। **"মনঃসংযম ও নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা ও সাধনা"** গ্রহণের মুদ্রিত আবেদন কলিকাতায় স্কুল-কলেজে বিতরিত হচ্ছে। প্রত্যহ শত শত বালক, যুবক, ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপক আচার্য্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দর্শন ও উপদেশ গ্রহণের জন্য ভিড় জমাচ্ছেন।

আচার্য্যদেব তদীয় মহাতপঃশক্তি সঞ্চারের তীব্র সঙ্কল্প নিয়ে সিদ্ধাসনে সমাসীন প্রত্যহ ভোর রাত্রি ৩টা থেকে বেলা ১১টা, পুনঃ বেলা ৩টা থেকে রাত্রি ১১টা। জলস্রোতের ন্যায় দর্শনার্থীর স্রোত, ফুটপাথ থেকে, তেতলায় আচার্য্যের কক্ষের দ্বারদেশ পর্যন্ত বুকেপিঠে চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে একে একে দর্শন করছেন। মে-জুনের নিদারুণ গ্রীষ্মেও ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে ঘর্মস্নাত হয়েও তাঁদের উৎসাহ দমে না—আচার্য্যের চৌম্বক আকর্ষণ ছিল এমনি দুর্বার।

ওদিকে সঙ্ঘের প্রচারকমণ্ডলী এবং একক বহু সন্ন্যাসী প্রচারক বাংলার সর্বত্র

স্কুলে, কলেজে ও জনসভায় সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্র গঠনের বক্তৃতায় ও আলোচনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। চারণগণের কণ্ঠে "আমরা কেন ভোগে ভুলিব, আমরা যে ভাই ত্যাগীর ছেলে!" ইত্যাদি সঙ্গীতে তরুণদলের সামনে আদর্শ জীবনের উজ্জ্বল আলোর হাতছানি। তরুণ ভারতের মৃতসঞ্জীবনী বাণী "ব্রহ্মচর্য্যম্" পুস্তক মুদ্রিত হয়ে সর্বত্র অজস্র প্রচারিত হয়েছে;প্রচারকমণ্ডলীর সাথে আচার্য্যদেব বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শহরে শুভাগমন করলে মৌমাছির ঝাঁকের মত জনগণ, বিশেষ ভাবে তরুণ দল তাঁকে ছেঁকে ধরছে। দেশময় প্রবল ভাবতরঙ্গ।

বিপ্লববাদিগণের মনে জাগলো দারুণ আশঙ্কা ও আতঙ্ক—দেশের তরুণদলের মতিগতি বুঝি বিপ্লববাদ্ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে বাঁক নিল! তাই বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত অনুযোগ সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের বিরুদ্ধে।

আচার্য্যদেব আবাল্য বিপ্লবী তরুণদলকে অন্তর দিয়েই ভালবাসতেন। তাদের কর্মপন্থার সমর্থক তিনি ছিলেন না। আচার্য্যের আকর্ষণ ছিল তাদের সংযম, নিষ্ঠা, বিলাসহীন কঠোর জীবন, শক্তিসাধনা, বীরত্ব ও তেজস্বিতা, জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম, দেশসেবার ক্লেশবরণ ও আত্মবলিদানের সঙ্কল্প। এই সূত্রেই বিপ্লববাদীদের সহিত তাঁর সংশ্রব।

আচার্য্যের স্নেহানুরাগ বিপ্লবীদের প্রতি এমনি আন্তরিক ছিল যে কোন কোন ঘটনায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি তাদের নিরাপত্তার চেষ্টা করতেন। এজন্য একবার সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে তাঁকে তিন মাস কাল কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। বিপ্লবীরা কিন্তু জানত যে ব্রহ্মচারী বিনোদ তাদেরই একজন। তাই তাদের—বিশেষ করে অমরেন্দ্রবাবুর উপরোক্ত অভিযোগ।

সঙ্ঘনেতা প্রসন্ন স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমরেন্দ্র বাবুকে বুঝিয়ে দিলেন—অমরেন্দ্রবাবু, আমি আজ নূতন মানুষ হয়ে যাইনি। আমি সেই ব্রহ্মচারী বিনোদ আগেও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। আপনিই বলুন—আদর্শ-উদ্দেশ্যহীন, সংযমশক্তিহারা নির্বীর্য্য তরুণের দল কি দেশের জন্য তিলে তিলে আত্মবলি দিতে, রক্ত ঢালতে পারে? আমি তাই দেশের বালক ও যুবক-সমাজের মধ্যে আনতে চাই—

সংযমসাধনা ও নৈতিক জীবন গঠনের শিক্ষা ও সাধনার ভিত্তিতে শারীরিক ও মানসিক বল, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মৃত্যুঞ্জয়ী সঙ্কল্প। তাই তারা আজ আমাকে গুরুরূপে মানে, পূজাভক্তি করে। আমি তরুণদের জীবন গঠন করে দিই। আপনারা তাদের নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন করুন।"

আচার্য্যের কথায় বিপ্লবী নেতার রোষ প্রশমিত হল, অন্তরে শ্রদ্ধা জাগল, তিনি প্রসন্ন হয়ে ভ্রান্ত ধারণার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র বাংলায় এক সংযম সাধনার ব্যাপক বাতাবরণ জেগে উঠল। বাংলার তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে আচার্য্যদেব স্নেহমাখা উৎসাহের বাণী ঘোষণা করলেন। **"সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনার পথে যারা আত্মজীবন গঠনে ব্রতী, তারা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তারা যখনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন আমার তপঃশক্তির রক্ষাকবচ সতত তাদের নিরাপদে রাখবে।"**

দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন বলতেন—আমি দেখছি যত উৎসাহী তরুণ আমার নিকট আসে, সকলেই বলে যে, তারা স্বামী প্রণবানন্দের কাছে জীবন ও চরিত্র গঠনের উপদেশ পায়।

এ থেকে বোঝা যায়, আচার্য্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তথা সংযম-সাধনা ও চরিত্রগঠনের শিক্ষা কীরূপে—সেই যুগের তরুণ সমাজকে পৌরুষ, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যে পথে এগিয়ে দিয়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ এক ॥

"আগামী বৎসর **কাশীধামে দুর্গাপূজা** করব!" সঙ্কল্প করেছিলেন সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব। তাঁর এই উক্তিটি এত সহজে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে এর কোন গভীর তাৎপর্য্য তখন কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি। নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূত্রে তা ধীরে ধীরে সঙ্ঘসন্তানদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

একটু ছোট ইতিহাস আছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে দিবারাত্র অনিয়মিত পরিশ্রমের ফলে আচার্য্যদেবের শরীর অসুস্থ ও শয্যাগত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের চিকিৎসায় সহসা কোন ফল দেখা গেল না। ব্যাধি ক্রমশঃ গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। চিকিৎসকগণ খুব ভরসা দিতে পারলেন না। সঙঘসন্তানদের নিকট সঙঘনেতা ইঙ্গিতে বললেন যে তাঁর শরীর ধারণের সঙ্কল্প শিথিল হয়ে এসেছে। তাঁর যদি শরীর ধারণের সঙ্কল্প না জাগে, তবে শুধু ডাক্তারেরা কী করতে পারে? সঙঘসন্তানেরা নিরাশ ও অসহায় হয়ে পড়লেন।

ক্রমে দুর্গাপূজা এগিয়ে এল। মহাষ্টমীর রাত্রে জনৈক ভক্ত তাঁর ব্যাধির আরোগ্য কামনা করে মায়ের আশীর্বাদ অর্ঘ্য এনে আচার্য্যদেবের মাথায় রাখলেন। তৎক্ষণাৎ আচার্য্যদেবের অন্তরে দেহধারণের ইচ্ছা পুনর্জাগ্রত হয় এবং তিনি ঐশী প্রেরণায় "আগামী বছর কাশীধামে দুর্গাপূজা করব" এই যে সংক্ষিপ্ত সহজ কথাটুকু বললেন তার মধ্যেই তাঁর রোগমুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

যে সমস্ত অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ জগৎকল্যাণের সঙ্কল্পে দেহধারণপূর্বক জগতে অবতীর্ণ হন, সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দেহ ধারণ করেন। মাঝে মাঝে নানা কারণবশতঃ তাঁদেরও দেহধারণের সঙ্কল্প শিথিল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে পুনরায় অন্তর থেকে নূতন ঐশী সঙ্কল্পের প্রেরণা এলে তাঁদের দেহধারণের সঙ্কল্প পুনর্জাগ্রত হয়।

সঙঘনেতার ক্ষেত্রেও সেই কথাই প্রযোজ্য। মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সাময়িক ভাবে তাঁর দেহধারণের সঙ্কল্প শিথিল হয়েছিল, জগৎকল্যাণের নূতন সঙ্কল্প অন্তরে জাগ্রত হওয়া মাত্র তিনি ব্যাধিমুক্ত হলেন। কী সে সঙ্কল্প, যাকে অবলম্বন করে তাঁর দেহধারণের ইচ্ছা জাগল, যা তাঁর প্রস্তাবিত কাশীধামে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাবে? সংক্ষেপে সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

সঙঘনেতা আচার্য্যদেব চেয়েছিলেন যুগোপযোগীরূপে বৈদিক আদর্শ ও জীবনধারার পুনঃপ্রবর্ত্তন। বৈদিক যুগে আর্য্য হিন্দুজাতি ছিল জীবনবাদী। তাদের নিত্যকার প্রার্থনা ছিল—"পশ্যেম শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ, আমি একশত শরৎকাল দেখতে চাই, একশত শরৎকাল জীবিত থাকতে

চাই। তখন তাঁদের মধ্যে প্রবল প্রেরণা ছিল বল ও বীর্য্যশক্তির সাধনা ও অনুশীলন! তাঁরা ত্রিসন্ধ্যা প্রার্থনা করতেন —" ওঁ বীর্য্যমসি বীর্য্যং মহি ধেহি" ইত্যাদি। অর্থাৎ, হে বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দান কর হে বলস্বরূপ, আমাকে বল দান কর, হে তেজঃস্বরূপ, আমাকে তেজঃ দান কর, হে ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ দান কর, হে মন্যুস্বরূপ, আমাকে (শত্রুনাশের) পবিত্র ক্রোধ দান কর।

পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগের অহিংসা দুঃখ ও বৈরাগ্যবাদ বৈদিক যুগে ছিল না। তাঁরা চাইতেন জগতের কল্যাণকর কর্মসাধন করতে করতে শত বছর বেঁচে থাকতে। সে যুগের ইতিহাস বা পুরাণাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্মের উদার বাণী ও সাধনাকে সমগ্র মানব সমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্য দেশ দেশান্তরে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং পৃথিবীর বহুদেশে রাজ্যগঠন এবং উপনিবেশও স্থাপন করেছিলেন। অদ্যাপি তার নিদর্শন এশিয়ার বহু দেশে তো বটেই, এমন কি আফ্রিকা আমেরিকাতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্য হিন্দুগণ যেমন ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী ছিলেন, তেমনি সেই কার্য্যে নিশ্চিত সাফল্য লাভের উপায়স্বরূপ তাঁদের মধ্যে ছিল সংগঠন, ঐক্য এবং আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারোপযোগী শক্তি ও উদ্যোগ। তাই শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানাদেশে মানব সমাজের অনিষ্টকারী অসুর, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব চেয়েছিলেন বৈদিক যুগের আদর্শের পুনরুদ্ধারপূর্বক এই সহস্র বছরের অধঃপতিত ভারতীয় হিন্দুজাতিকে পুনরভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর করে দিতে। তিনি চেয়েছিলেন মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির মধ্যে মহাশক্তির সাধনা ও অনুশীলন প্রবর্ত্তনপূর্বক তাকে সংগঠিত, শক্তিশালী ও দিগ্বিজয়ী করে তুলতে।

॥ দুই ॥

পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের উদার বাণী ও সাধনা প্রচার করে এলেও ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু তা করেন নি। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতবাসীর অবস্থা

লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন—ভারতীয় জাতি একটা বিরাট কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে আত্মচেতনা হারিয়ে মৃতবৎ পড়ে আছে। একে বেদান্তবাণীর পরিবর্ত্তে শক্তির বাণী শুনিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলা আগে প্রয়োজন। নিঃস্ব দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীর পেটে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা প্রথমে চাই। তাই তিনি মনের ক্ষোভে বলেছিলেন—"গীতা পড়া ছেড়ে রেখে তোরা ফুটবল খেল, ডন কসরৎ কর, গায়ে একটু তাকত হলে বেদান্তের বাণী বুঝতে পারবি।"

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব তাঁর তপঃশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন—জাতি আজ ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষু। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে উচ্চ আদর্শ ও সাধনার বাণী শুনিয়ে কী ফল? প্রথমে তার দেহে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে হবে, তার পরে তাকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক সর্ববিধ শক্তির অনুশীলনে দীক্ষা দিতে হবে। তাই তিনি ঘোষণা করলেন—"বেদ বেদান্তের আদর্শ ও বাণী কিছুদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখ; জাতিকে শক্তিসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তোল; সমাজের সকল স্তরে, সকল শ্রেণীর মধ্যে শক্তি সাধনা প্রবর্ত্তন করতে হবে। তাদের মধ্যে সংগঠন ও আত্মরক্ষার শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই জাতি আপন বেগে আত্মপ্রসারের পথে অগ্রসর হতে পারবে।"

॥ তিন ॥

জাতীয় জীবনে মহাশক্তি সঞ্চারের এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি কাশীধামে অভিনব পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা উৎসবের আয়োজন করলেন। তাঁর নির্দেশে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ও বহির্ভারতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবক-সম্বলিত দশটি প্রচারক মণ্ডলী কাশীধামে সমবেত হল। সঙ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত দুর্গাপূজায় আমন্ত্রণপত্র নিয়ে তারা কাশীধামের গৃহে অনুরোধ জানিয়ে ফিরতে লাগল। সন্ন্যাসীর গৈরিক দীপ্তিতে সমস্ত কাশীধামে যেন নূতন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শের পরিবেশ সৃষ্টি হল।

কাশীধাম আবহমান কাল ধরে হিন্দুধর্মের পীঠস্থান; সাধু, সন্ন্যাসী, তপস্বী, মহাপুরুষ, সিদ্ধপুরুষগণের তপঃক্ষেত্র ও প্রচারকেন্দ্র। কয়েক শতাব্দীর পর ত্যাগী

সন্তানবাহিনী সহ মহাতপঃ-শক্তিশালী সঙ্ঘনেতার শুভাগমনে আবার সেখানে ধর্মের নবজাগরণ অনুভূত হতে লাগল। জনসাধারণের প্রাণে একটা অভিনব অধ্যাত্ম মহাভাবের আভাস জেগে উঠল।

মহাসমারোহে দুর্গাপূজা সমাপ্ত হল। তিন দিবস-রাত্র-ব্যাপী ভজন-কীর্ত্তন, দেবীপূজারতি ও গুরুপূজারতি তথা সমাগত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে দিগ্‌দেশ হতে সমাগত সকলে ভাবের আবেগে আত্মহারা হয়ে রইল।

॥ চার ॥

কিন্তু তখনো দুর্গাপূজানুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য সঙ্ঘ-সন্তানদের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়নি ; জনসাধারণের মধ্যে তো নয়ই। সে হয়েছিল ধীরে ধীরে ভাববিকাশের ক্রমঅভিব্যক্তির সূত্রে কয়েক বছর পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ; যখন সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব **"হিন্দুজাতি গঠন"** ও **"হিন্দু সমাজসমন্বয়"** কর্মপন্থার পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

তখন থেকে দূর্গাপূজার উপরোক্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান সংযোজিত হল। মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রত্যহ হিন্দুসম্মেলনের অনুষ্ঠানে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা, চর্চ্চা ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হত ; হিন্দু জাতিগঠন পরিকল্পনার অত্যাবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে সঙ্ঘ কর্তৃক গঠিত হিন্দু রক্ষিদলের আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শিত হত। সশস্ত্র রক্ষিদল সহ আত্মরক্ষা ও বীরত্বমূলক যুদ্ধক্রীড়া সহ দেবীর আরতি চলত অন্ততঃ এক প্রহর কাল। সহস্র সহস্র দর্শকের প্রাণে তখন কী এক অপূর্ব ভাবের তরঙ্গ খেলতো যার আবেগে তারা এই সুদীর্ঘকাল নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অপলক নেত্রে এই আরতি দর্শন করত।

হিন্দু-সম্মেলনের অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় বিদ্বান্, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হয়ে যোগদানপূর্বক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। দেবী দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁর লীলার মধ্যে যে সঙ্ঘশক্তির এবং ক্ষাত্রশক্তির সাধনার আদর্শ ও প্রেরণা নিহিত আছে এবং জাতি ও সমাজের পুনর্গঠনের আদর্শ

ও ইঙ্গিত বিদ্যমান, তা নানা আকারে প্রচারিত হত। বিষ্ণু-মহেশাদি দেবগণের মিলিত তেজঃ থেকে মহিষাসুরহন্ত্রীর এবং পরাজিত ও স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের মিলিত প্রার্থনা ও স্তুতিতে শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী মহাদেবীর আবির্ভাব। মহাদেবী সকল সুরগণপ্রদত্ত বেশভূষা, বাহন ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সহায়ে অমিত বলসঞ্চয়পূর্ব্বক দেবশক্তিকেও সংগঠিত ক'রে মহিসাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভাদির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং দুর্ধর্ষ অসুরগণকে পরাজিত ও নিহত ক'রে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—চণ্ডী-সপ্তশতীবর্ণিত দেবীর মধ্য ও অন্ত্য লীলার রহস্য অনুধাবন করলে, জাতি সংহতিশক্তিগঠন, ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশ-প্রকাশ, হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার, দিগ্বিজয় প্রভৃতির আমোঘ প্রেরণাই কি প্রকাশ পায় না? শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার সহিত পূজিত ও আরাধিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ কি যথাক্রমে বৈশ্যশক্তি, ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও গণশক্তির প্রতীক নয়? জাতি ও সমাজগঠনের সামগ্রিক দিকের সমন্বয় ও সমৃদ্ধি বিধানের ইঙ্গিতই কি নিহিত নেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার রহস্যোদ্ভেদের ভিতর? শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা কি জাতি-প্রতিমা নয়?

দেবীপূজার বিধি কি? কি উপচারে কি আদর্শে পূজা করলে তবে দেবী হন যথার্থ প্রসন্না? শুধু কি নৈবেদ্য আরু পুষ্পবিল্বদলে দেবীর মন ভরে? উত্তর—না। শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব এতদ্ প্রসঙ্গে যা শিখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, তার সারমর্ম্ম এই ঃ

দেবী—অসুরনাশিনী ; তাই তাঁর মহাপূজায় চাই—হিন্দু নরনারীর অন্তরে অসুরনাশের অটুট সঙ্কল্প—অন্যায় অবিচার অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রবল প্রচেষ্টা। দেবী—মহাবীর্য্যরূপিণী, তাই তাঁর পূজায় চাই—আত্মশক্তির উদ্বোধন, বিকাশ, প্রকাশ—আত্মরক্ষার্থ হিন্দু নরনারীকে শক্তি ও কৌশল অর্জ্জনপূর্ব্বক অত্যাচারের প্রতিকারে উদ্যত থাকা। দেবী—সমষ্টি-শক্তিস্বরূপিণী; তাই চাই—হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীকে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। সমগ্র হিন্দুজনসমষ্টির মিলন ও সংহতির ফলে যে বিরাট জাতি-প্রতিমা গঠিত হবে—তাতে আবির্ভূতা হবেন—মহাবীর্য্যময়ী, দানবদলনী শ্রীশ্রীদুর্গা।

দেবী—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা সংগ্রামরতা তাই দেবীপূজায় চাই—অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দেবীর আরতি ও প্রসন্নতা ; তাঁর সন্তানগণকেও হতে হবে অস্ত্রচালনায় ও যথাযোগ্য স্থানে অস্ত্রের সদ্ব্যবহারে সুনিপুণ ও অভ্যস্ত।

॥ পাঁচ ॥

সন ১৩৪৫ সালে সঙ্ঘের প্রথম কালীপূজায় প্রবর্ত্তন—দুর্বৃত্তবৃত্তনাশিনী চামুণ্ডাশক্তির আহ্বান ও বন্দনা। নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গধারিণী, লোলরসনা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী, মুক্তকেশী, ভীমা, ভয়ঙ্করী মহাকালী কালভয়নাশিনী। সে দিনের রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ঙ্কর কালে হিন্দু-সমাজের উপর যে ভয়ের কারণগুলি আপতিত হয়েছিল, সে ভয় থেকে উত্তরণের ও বীর্য্য সঞ্চারের জন্যই কালীপূজার নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা। রণরঙ্গিণী কালীর পূজা ক'রে সাধক সন্তান যদি অন্যায়, পীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রণদুর্ম্মদ হ'তে না পারে, তবে পূজা কি ব্যর্থ হয় না?

হিন্দু-সম্মেলনের বিরাট মণ্ডপে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের পশ্চাতে মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত ঐ ত্রিদেবতা কে? তাঁর একজন হলেন ধনুর্ব্বাণধারী, রাবণারি শ্রীরাম, অন্যজন হলেন সুদর্শনধারী কংসদর্পহারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং তৃতীয় দেবতা হলেন ত্রিশূলধারী দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী ত্রিপুরারি শঙ্কর। সঙ্ঘের উদ্যোগে যেখানে যেখানেই হিন্দু-সম্মেলনের আয়োজন হয় এবং সঙ্ঘনেতা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, সেখানে সেখানেই এই ত্রিমূর্ত্তি বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ত্রিদেবতার শক্তি ও ভাব যেন এক সঙ্ঘনেতার আদর্শ, চরিত্র ও কর্ম্মধারায় মূর্ত্ত। তিনিও ত্রিশূলদণ্ডপাণি, তাঁর পশ্চাতে শাণিত খড়্গধারী সন্ন্যাসী সৈনিক, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন তিনি এবং ব্রতী হয়েছেন শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপনশীলায়। দুর্ব্বল, ভীরু, আত্মরক্ষায় অক্ষম, শত পীড়ন ও লাঞ্ছনায় মুহ্যমান, বিশেষতঃ সহস্রাব্দের পরাধীনতার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে নিবদ্ধ হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় তিনি শক্তি ও বীর্য্যঘনমূর্ত্তির ধ্যান, মনন ও আরাধনার শিক্ষা ও উপদেশ দিচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বয়ং শারীরিক,

মানসিক আধ্যাত্মিক—সর্ব্ববিধ শক্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিরাজপূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ নরনারীকে চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছেন।

শক্তি, শক্তি, শক্তি হিন্দুর বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত সর্ব্বত্র এই শক্তির জয়গান। কোথাও নেই দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, তামসিকতা ও পরাজয়-মনোবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়। হিন্দুর ঋষি, মহর্ষি, আচার্য্য, সাধক, মনীষীদের সত্যনিষ্ঠ জীবনেও দেখি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কি অটল ধৈর্য্য, কি অপ্রতিহত মনোবল, কি অপরিসীম ত্যাগ, কি অত্যদ্ভুত সংগ্রামশীলতা, কি অটুট নিষ্ঠা, কি অলৌকিক তেজস্বিতা। তাঁরাও মহাশক্তিমান। ভারতের তরুণ এক একটি শক্তির জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গ। ভক্তির নামে ভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণা, বৈরাগ্যের নামে কর্ত্তব্যবিমুখতা ও কর্ম্মকুণ্ঠা, ক্ষমার নামে নিশ্চেষ্টতা ও অক্ষমতা, অহিংসার নামে ভীরুতা ও অপ্রতিকারেচ্ছা এলো কোথা থেকে, কবে? এ অপধর্ম্ম ঝাঁটিয়ে দূর করতে হবে—এই ছিল আচার্য্যের কঠোর নির্দ্দেশ।

সপ্তম অধ্যায়

॥ এক ॥

"লোকে জপ করে কাঠের মালায়, তুলসীর মালায়, আমি আজীবন জপ করেছি 'জাতিগঠনের মালায়"— শ্রীশ্রীআচার্য্যের এ উক্তি। তা থেকেই আমরা উপলব্ধি করি—ধর্ম্মভিত্তিতে শক্তিমান, বীর্য্যবান, সংহতিবদ্ধ ও উন্নতিশীল জাতিগঠনই ছিল তাঁর সমুদয় চিন্তা, চেষ্টা কর্ম্মযোজনার মূল লক্ষ্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-সংস্থাপন লীলা যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে মূর্ত্ত। তিনি আসেন নি শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধিপূর্ব্বক কোনও সম্প্রদায় গড়তে—তাঁর আবির্ভাব সমগ্র হিন্দুজাতির পুনরুজ্জীবনের মহান্ প্রয়োজনের সম্যক্ সিদ্ধির ভাগবত সঙ্কল্পে। ভারতের আর্য্যহিন্দুজাতির জন্ম ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি ও আচার্য্যের হস্তে। তাঁরাই যুগে যুগে জাতির ত্রাতা, পাতা, নেতা, সংগঠক ও পথনির্দ্দেষ্টা। এ যুগে

তপঃসিদ্ধ মহাযোগেশ্বর স্বামী প্রণবানন্দের মধ্য দিয়েই নেমে এসেছে— জাতিগঠনের বাস্তব নির্দ্দেশ ও কর্ম্মপ্রণালী।

ভারতে আছে নানা সম্প্রদায়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং, জাতিগঠনের প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে অতি জটিল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য গ্রহণ করেছেন তোষামোদ ও দাবী পুরণের পথ। কিন্তু ; সে পথে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ ও বৃহত্তর জাতীয় সংহতি আসে নি, বরং সাম্প্রদায়িকতা আরো ক্রমবর্দ্ধনশীল। তবে উপায় কি? স্বামী প্রণবানন্দজী বহু পূর্ব্বে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এই ব'লে যে, এ পথে অভীষ্ট লাভ অসম্ভব। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত—**"হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন ও ঐক্য যত শীঘ্র গড়ে উঠবে, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানে মিলন তত দ্রুত সম্ভব হবে। কেন না, মিলন হয় সমানে সমানে, সবলে সবলে। সবলে দুর্বলে মিলন কদাপি সম্ভব নয়। মুসলমান ও খ্রীষ্টান—সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হিন্দু সংখ্যায় অধিক হলেও অসংগঠিত সুতরাং দুর্ব্বল। মিলন হবে কেমন করে?"** ভারতের সমস্যা হিন্দু-মুসলমানে মিলন নয়—হিন্দুজাতিগঠন। বৃহত্তর জাতীয় সংহতির স্বার্থেই হিন্দুজাতিগঠনের কাজে আগে হাত দিতে হবে। এতে নেই কোনও সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র।

* * *

"যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে মামলা কর, তাদের সাজা হোক—বলেন আচার্য্যদেব বাজিতপুরের খেলার মাঠে প্রতিবেশী মুসলমানদের দ্বারা নিপীড়িত হিন্দুগুণকে লক্ষ্য করে। কিন্তু হিন্দুরা রাজী নয়। কারণ, মামলায় অনেক অর্থব্যয় তো আছে, তা দেবে কে? আদালতে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, ঝঞ্ঝাটও কম নয়। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা নিজেরা সংগঠিত হয়ে এই অত্যাচারের প্রতিকার করতেও অক্ষম।

"তবে তোমরা আমাকে কলকাতা থেকে খবর দিয়ে ডেকে আনলে কেন?" আচার্য্যের এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীরা বলে—"মহারাজ, আপনি এ গণ্ডগোলটা মিটিয়ে দিন, আর যাতে কোনও অশান্তি না হয়।" সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টিপরায়ণ

আচার্য্যদেবের প্রভাব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর সমান। তিনি শান্তি স্থাপনে সক্ষম, এ বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল। তিনি মুসলমানদিগকেও ডাকালেন।

"হিন্দুরা তোদের বিরুদ্ধে মামলা করবে, তোরা তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছিস?" উত্তরে মুসলমান প্রতিনিধিরা বলে—তারা গ্রামে গ্রামে মিটিং করে ইতোমধ্যেই কয়েক শ টাকা আদায় করে ফেলেছে, প্রয়োজন হলে আরো করবে। হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিকার প্রচেষ্টারই মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত। "আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, এ ঘটনায় প্রকৃত অপরাধী কারা?" জানতে চাইলে অকপটেই উত্তর আসে—অপরাধী মুসলমানরাই। আচার্য্যদেব বলেন—"তবে সবাই মিলে জোট পাকানো কেন? তোরা সকলে দূরে সরে যা, যারা অপরাধী তারা সাজা পাক। আমি হিন্দু-মুসলমান কিছু বুঝিনে, যে অপরাধী তাকে আমি সাজা দিতে চাই।" মুসলমান প্রতিনিধিরা জানায়, তা তারা করতে পারবে না, হোক হাজার অপরাধী, কিন্তু, জাত-ভাইকে তারা বিপদে ত্যাগ করতে পারবে না।

উত্তর শুনে আচার্য্যদেব স্তম্ভিত। উপলব্ধি করেন হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য কোথায়, আর কেনই বা হিন্দু সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত। স্থির করেন হিন্দুসংগঠনের কাজকে আর ফেলে রাখা যায় না। সম্মুখে সমূহ বিপদ। আচার্য্যদেব ঝাঁপিয়ে পড়েন তদীয় সঙ্ঘের সর্ব্বশক্তি নিয়ে।

॥ দুই ॥

রাম-শ্যাম দুটি লোক পাশাপাশি শুয়ে আছে। রামকে 'রাম' এবং শ্যামকে 'শ্যাম' ব'লে ডাক দিলে তবেই তারা সাড়া দেয়। তেমনি হাজার বছরের ঘুমন্ত হিন্দুজাতি জাগবে কেমন করে? আচার্য্যের বাণী—**"আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে "আমি হিন্দু" "আমি হিন্দু" জপ করাবো। তাদের মধ্যে সংহতি ও মহাশক্তি সঞ্চার করবো।"** বস্তুতঃ হিন্দুকে হিন্দু নামে কেউ ডাক দেয়নি। কেউ ডাক দিয়েছে 'ব্রাহ্ম' বলে, কেউ

আর্য্য বলে, কেউ বা ব্রাহ্মণ, কায়স্ত, কর্মকার, সুবর্ণ বণিকাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের নামে; তাতেই বিশাল হিন্দু জাতি সহস্রধা বিভক্ত। প্রতিকারের উপায়—এর হিন্দুত্বের ভিত্তিতে সকলকে সুসংগঠিত করে নেওয়া । আচার্য্যদেব বলেন— **"হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, সংখ্যায়ও হিন্দু সকলের চেয়ে বেশি, কিন্তু নেই কেবল তার সংহতি শক্তি। এই সংহতিচেতনা জাগিয়ে দিলে হিন্দু জগতে অজেয় হবে।"**

তিনি আরো বলেছেন—"রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সহযোগিতা স্থাপিত হলেও হিন্দু-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে যাবে না। কারণ, হিন্দুসংগঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুর জীর্ণ গৃহের সংস্কার। এই আন্দোলন কোনও প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত নয়—ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ব্বিরোধ, আত্মগঠনমূলক।"

"এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্য তোমাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। হীন অন্ত্যজ জাতিকে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে।"— সঙ্ঘসন্তানগণের প্রতি শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার এ অনুজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল আজ নয়, সেই প্রায় সঙ্ঘজীবনের প্রথম উষায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বলে সমাজ যাদের দূরে রেখেছে, তাদের শক্তি অপরিসীম। সরল স্বধর্ম্মনিষ্ঠা যেমন তাদের আছে; তেমনি আছে বাহুবল। এ শক্তির প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা চলে না; বিদেশী ও বিধর্ম্মীর প্রলোভনে দলে দলে তারা ধর্ম্মান্তরিত হয়ে হিন্দু-সমাজকে অধিকতর দুর্ব্বল ও ক্ষীয়মান করে তুলছে। নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, বাউরী, হাঁড়ি, মুচি, ডোম আদি তপশীলী হিন্দু এবং সাঁওতাল, কোল, ভীল, নাগা, মুণ্ডা, বাইগা আদি তপশীলী উপজাতিরা হিন্দুজাতির অপরিহার্য্য অঙ্গ। এক শ্রেণীর রক্ষণশীল মানুষের ভ্রান্ত নীতি ও আভিজাত্য বিশাল হিন্দু-সমাজের ভিতরে ধরিয়ে দিয়েছে ক্ষতিকর ফাটল। এই শ্রেণীর রক্ষণশীল হিন্দুগণকে লক্ষ্য করে আচার্য্য বলেন—"হিন্দু কখনো হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য হতে পারে না, অনাচরণীয় হতে পারে না। শাস্ত্রপ্রণেতা আর্য্য ঋষিগণ কদাচ একথা স্বীকার করেন নি—তা তাঁদের স্বীয় স্বীয় জীবন ও আচরণে

প্রকাশ। মধ্য যুগের ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী-আচারের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে, শাস্ত্র-সদাচার ভুলে, আত্মবিস্মৃত হিন্দু জনসাধারণ এ কুসংস্কার আকড়ে ধরে আছে। হিন্দু-সমাজের এই অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতার গ্লানিকে মুছে ফেলতে হবে।" এদিকে তথাকথিত অনুন্নত হিন্দুগণকেও শিক্ষা, দীক্ষা ও সদাচারে উন্নত হয়ে তাদিগকে সমাজে নিজ যোগ্য স্থান গ্রহণে তিনি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এজন দিনের পর দিন তাদের পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করেছেন, স্নেহ-সমাদর-ভালবাসায় তাদিগকে কাছে ডেকেছেন, তাদের জন্য বিদ্যালয় গড়েছেন, দু'হাতে সাহায্য বিলিয়েছেন, উৎসবাদিতে আহ্বানপূর্ব্বক বেদমন্ত্র উচ্চারণে যেমন অধিকার দিয়েছেন, তেমনি উন্নত হিন্দুগণের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিয়ে তাদিগকে খাইয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ভিতর থেকে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার মহাপাপ দূরীভূত করে এক ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যদ্ধ করার জন্য তিনি এক সর্ব্বগ্রাসী ও অভিনব আন্দোলন প্রবর্ত্তন করলেন, সে আন্দোলন **হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন** নামে খ্যাত। পরবর্ত্তীকালে এ আন্দোলনের বাস্তব সাফল্যের জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল হিন্দু মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল কর্ম্মপদ্ধতি। তাঁর সঙ্কল্প ছিল—বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে হিন্দু-মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল গঠন করতে হবে এবং এর ভিতর দিয়ে বিশাল হিন্দুজাতিকে এমন ভাবে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে যেন হিন্দুর এক অঙ্গে আঘাত আক্রমণ এলে তার ব্যথা বেদনা মুহূর্ত্তে জাতির সমস্ত অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিকারার্থে সকল স্থান হতে সাহায্য ও সহানুভূতি এসে পৌঁছায়। আচার্য্যের আদেশে সঙেঘর প্রচারক ও কর্ম্মিদল গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ছুটলেন—সহস্র সহস্র হিন্দু মিলন মন্দিরের শাখা ও রক্ষিদল গঠিত হতে লাগলো—তিনি নিজেও রইলেন অবিশ্রান্ত কর্ম্মরত। এই সময় তিনি আহার-নিদ্রা, বিরাম-বিশ্রাম, শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, আলাপন, প্রচেষ্টা হলো হিন্দুজাতি গঠন।

॥ তিন ॥

"আমরা রচনা করবো এমন একটা মিলন-ক্ষেত্র, সেখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত হবে। এই মিলন-ক্ষেত্রের নাম হবে—**হিন্দু মিলন-মন্দির**। এ হবে হিন্দুর সার্ব্বজনীন মিলন-ক্ষেত্র সম্মিলিত শক্তিকেন্দ্র। যে কোন সময়ে যে কোন পর্ব্ব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র হিন্দু তথায় সম্মিলিত হবে। এই মিলন-মন্দির হবে—ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও সঙঘশক্তিসংগঠনের কেন্দ্র। **এই মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়েই হিন্দুর পরিবার, সমাজ—জাতীয় জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে।**

মুসলমানের যেমন মসজিদ, খ্রীষ্টানের যেমন চার্চ্চ, হিন্দুর তেমনি হিন্দু মিলন-মন্দির। মুসলমান যেমন মসজিদে গিয়ে নামাজ করে, খ্রীষ্টান গীর্জ্জায় গিয়ে যেমন প্রার্থনা (Prayer) করে, হিন্দুকেও তেমনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন হিন্দু মিলন-মন্দিরে সম্মিলিত হয়ে সমবেত ভাবে বৈদিক সান্ধ্যোপাসনা, ভজন-কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদি পাঠের সহিত জাতীয় সমস্যাবলীর আলোচনা এবং কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগের চিন্তা চেষ্টা করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিরাট হিন্দুজনতার মধ্যে স্বধর্মচেতনার সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড ঐক্যচেতনা জেগে উঠবে।"

"হিন্দু মিলন-মন্দির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র হিন্দু অধিবাসিগণকে এমন আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে অত্যল্পকালের মধ্যে তারা দেশের সব রকম আন্দোলন গ্রহণ করতে পারে এবং সর্বাবস্থায় 'আপন আপন কর্ত্তব্য নির্ণয় করে চলতে সমর্থ হয়।"

"আমি চিন্তা করছি এমন এক কর্ম-পরিকল্পনা যা আসন্ন ভবিষ্যতে দেশের সকলকে গ্রহণ না করে উপায় নেই। আমি যে আন্দোলন প্রবর্ত্তন করবো তার দ্বারা জাতিগঠনকল্পে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মপন্থাই সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে, অথচ কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কর্ম্মপন্থার সহিত বিরোধিতা থাকবে না।"

এ সকল উক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যায়—হিন্দু মিলন-মন্দির আন্দোলন

কি? তার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্ম্মধারা কি? তার গতি-প্রকৃতি কি? তার উপযোগিতাই বা কি? ধর্ম্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন সকল জাতীয় সমস্যার সুসমাধানেই আগ্রহী। প্রতি মিলন-মন্দিরে একটি করে সার্ব্বজনীন উপাসনা-মন্দির থাকবে। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে স্কুল, লাইব্রেরী, ধর্ম্মশালা, ব্যায়ামশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, সেবাবিভাগ, সমাজ-রক্ষা ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ধর্মান্তরনিরোধ, নারীরক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ, পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ, অনুন্নত ও আদিবাসী কল্যাণবিভাগ এবং অরো নানা গঠনমূলক কার্য্যের ব্যবস্থা। পল্লীবাসীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এক শক্তিশালী কমিটি হিন্দু মিলন-মন্দিরের কার্য্যাদি পরিচালনা করবেন। হিন্দু মিলন-মন্দিরের প্রধান কার্য্যলয় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত। তার অধীনে প্রতি জেলায় জেলায় কেন্দ্র গঠিত হবে। জেলার অধীনে প্রতি মহকুমায় মহকুমার অধীনে প্রতি থানায়, থানার অধীনে প্রতি ইউনিয়নে এবং প্রতি ইউনিয়নের অধীনে প্রতি পল্লীতে গঠিত হবে হিন্দু মিলন-মন্দির। এই ভাবেই হিন্দু-মিলন-মন্দিরের জাল ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বাংলায় তথা প্রতি প্রদেশে প্রদেশে। এইভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুজাতি গঠনের পরিকল্পনা সফল হলে, তখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের মিলনের প্রশ্ন পিছিয়ে থাকবে না। ভারতে বৃহত্তর জাতিগঠনের এই হলো সুসঙ্গত বাস্তব সোপান। অন্য পথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ বেড়েই চলবে এবং চলছেও।

॥ চার ॥

"আমি কোন কাপুরুষকে সঙ্গে নেব না যে মাথা নিতে এবং মাথা দিতে পারবে সে আমার সঙ্গে চলুক"—হিন্দুসংগঠন কার্য্যব্যপদেশে কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম সফরে বহির্গত হবার প্রাক্কালে এ কথা বলেছিলেন জাতি-সংগঠক নেতা স্বামী প্রণবানন্দজী তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানগণের আলোচনা-বৈঠকে। কুমিল্লায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সভা সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তগণের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হলে সঙঘ কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য কি হবে, এটিই ছিল সেদিনকার

প্রধান আলোচ্য। সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ ছোটখাটো ঘটনা উপেক্ষার পক্ষপাতী, কেউ কেউ 'জ্যায়সাকে ত্যায়সা' প্রতিদানের কথা বলেছিলেন। আচার্য্যদেব চরম কথা শুনিয়ে দিলে সকলের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়।

বাংলার হিন্দু যখন নানা ভাবে বিপর্য্যস্ত—তার মন্দির-বিগ্রহ চুর্ণিত, নারী ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা, তার মান, ইজ্জৎ, ধর্ম্ম, স্বার্থ ও অধিকার বিপন্ন আত্মরক্ষার প্রশ্ন যখন সকল সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে, তখন রুদ্রের শক্তি নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি,—ভীত, সন্ত্রস্ত লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে অভয়, আশ্বাস ও আশ্রয় দিতে সমুদ্যত যিনি, সত্যই তো কাপুরুষ দিয়ে তাঁর কোন্ উপকার সাধিত হবে? তিনি চান—বীর সৈনিক, যারা স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ ও স্বজাতিরক্ষায় হাসিমুখে প্রাণবলিদানে প্রস্তুত। দু'দশ জন নয়, চাই লক্ষ লক্ষ। তজ্জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল **'রক্ষিদল আন্দোলন**।' মিলন-মন্দিরের ভিতর দিয়ে হবে আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও সংগঠন। রক্ষিদল আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হবে আত্মরক্ষার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও বীর্য্যের সঞ্চার তথা বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রামে উপযুক্ত শুর সেনাবাহিনীর রচনা।

* * *

"তোমরা জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়; এই প্রতিজ্ঞাপত্র নিয়ে যাও, এতে স্বাক্ষর করিয়ে রক্ষিসেনা সংগ্রহ করবে।"

ইং ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু-সম্মেলনে পাঁচ লক্ষ সেনা নিয়ে শক্তিশালী রক্ষিদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই আচার্য্যদেব তাঁর সন্ন্যাসিবাহিনী ও কর্ম্মিদলকে পাঠিয়ে দেন বাংলার নানাস্থানে। ১৫ বৎসর থেকে ৪৫ বৎসর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তিই রক্ষিদলভুক্ত হতে পারবে। এ রক্ষিদলকে আত্মরক্ষার শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তারা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের উপর অনুষ্ঠিত যে কোন আঘাত আক্রমণের প্রতিদানের জন্য সর্ব্বদা থাকবে প্রস্তুত। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতাই-মহাপাপ; বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্বই মহাপুণ্য—এই হবে তাদের মূল মন্ত্র।

রক্ষিদল আন্দোলনের রহস্য উদ্‌ঘাটনপূর্বক তিনি বলেন—"জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাপুরুষ নিশ্চেষ্ট যে, বিধাতাও তার প্রতি বিমুখ। হিন্দুকে আজ ক্লৈব্য পরিহারপূর্বক জীবন-সংগ্রামে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাঙ্গালী হিন্দুর শিরায় শিরায় আজ চাই দুর্জ্জয় বীর্য্যের, হৃদয়ে হৃদয়ে দুর্দ্দম সঙ্কল্পের সঞ্চার। **শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ** যে সংগঠনপন্থায় যথাক্রমে মহারাষ্ট্র ও শিখ জাতিকে নবজীবন দান করেছিলেন, আমি বাংলায় সেই সংগঠন পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দু সমাজের যাবতীয় তুচ্ছ-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।"

* * *

"মহারাজ, আমাদের বাঁচান। চারিদিক থেকে দুর্বৃত্তগণের দ্বারা আমরা অবরুদ্ধ—পথঘাট বন্ধ, হাটবাজার বন্ধ, নানা প্রকার হুম্‌কিতে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, জীবন আমাদের বিপন্ন"—নোয়াখালির গোবিন্দপুর পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে একজন কোন রকমে পালিয়ে কলকাতা এসে সঙ্ঘনেতার পা দুটি জড়িয়ে ধরে। আচার্য্যদেব তখনি তাকে দেন অভয় ও আশ্বাস। নোয়াখালি জেলায় কর্ম্মরত সন্ন্যাসীকে লিখে পাঠান—অবিলম্বে রক্ষিদল নিয়ে বিপন্নের বাড়ীতে উপস্থিত হতে এবং তার পরিবারবর্গকে অবরোধ মুক্ত করতে। রক্ষিদলের উপস্থিতিতে কাজ হয়। দুর্বৃত্তদল গা ঢাকা দিযে সরে পড়ে। এরূপ নানা ঘটনা পাবনা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য ঘটতো। সংবাদ পেলেই ছুটে যেত রক্ষিদল—বিপন্নের উদ্ধারে, নারীরক্ষায়, আর্ত্তকে আশ্বাস দানে, অন্যায় ও পীড়নের বলিষ্ঠ প্রতিকারে।

* * *

"কে আছ গুরুভক্ত শিষ্য, আমি বলি চাই"—আহ্বান জানিয়েছিলেন গুরুগোবিন্দ সিংহ তাঁর শিষ্যগণকে—ইসলাম শাসক গণের প্রচণ্ড অত্যাচারের

প্লাবনে যেদিন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি মহাবিপদের সম্মুখীন। শ্রীগুরুর আহ্বানে পাঁচজন শিষ্য এগিয়ে এসেছিল উদ্যত কৃপাণের মুখে আত্মবলিদানের জন্য। গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—"যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জন ব্যক্তি ধর্মরক্ষায় প্রাণবলিদানে প্রস্তুত, সে জাতির মৃত্যু অসম্ভব।" শিষ্যপঞ্চককে খাল্সা ব্রতে (মুক্ত) দীক্ষা দানপূর্ব্বক তিনি নিয়োগ করলেন তাদিগকে স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতি রক্ষায়—আর হাতে তুলে দিলেন শাণিত কৃপাণ। এ ভাবে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে খাল্সা বাহিনী গঠনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি। "ওরা গুরুজী কী ফতে"—এই বিজয়ধ্বনি উঠেছিল শিখজাতির কণ্ঠে কণ্ঠে এবং তাঁরা বিধর্ম্মীর রাহু গ্রাস থেকে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নব যুগের গুরু বা আচার্য্য আত্মবলিদানের অনুরূপ আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি হিন্দুর ঘরে ঘরে রক্ষিদল আন্দোলনের ভিতর দিয়ে, আর প্রকাশ্য সভাতে বিতরণ করেছিলেন সহস্র সহস্র শিবশক্তিপূত ত্রিশূল—শক্তি-সাধনা এবং আত্মরক্ষার প্রেরণা সঞ্চারের জন্য। যদিও 'রক্ষী' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই তিনি কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন, অর্থ-সামর্থ্য, বুদ্ধি-পরামর্শ, শুভেচ্ছা-সহানুভূতি, যে ভাবেই হোক, হিন্দু-সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষার কার্য্যে যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য দেবেন, তিনিই রক্ষী। কিন্তু বিশেষ অর্থে রক্ষী তারাই যারা বলিষ্ঠ ও যুবা, যারা অস্ত্রধারী, যারা স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিরক্ষায় যুদ্ধরত সৈনিকের ন্যায় সদা প্রস্তুত, যারা সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত বাহিনীর এক একজন বীর যোদ্ধা। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে তরুণ সমাজই মুখ্য ভরসা। তিনি চেয়েছিলেন—বাংলার অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ তরুণ ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা, লঘু আমোদ-প্রমোদ, যৌবনোচিত চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়সেবা বর্জ্জনপূর্বক ত্যাগ-সংযম সত্য ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ হয়ে, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করে শক্তিসাধনায় দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বীর বিক্রমে এগিয়ে আসুক। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতমাতার সেবায় স্বদেশভক্ত সহস্র যুবক বলি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন এমন যুবা যারা প্রকৃত মনুষ্যত্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পশু নয়। কিন্তু স্বামী প্রণবানন্দ যে যুগে নেতৃত্বের ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়ে জাতীয় তরণীর কর্ণধার, সে যুগের সমস্যা অন্য প্রকার, অত্যন্ত জটিল, ভয়াবহ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং পূর্ব্ব প্রান্তে আসাম ও বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তখন অশুভ শক্তির বিরাট ষড়যন্ত্র ও প্রচণ্ড তাণ্ডব। এ ষড়যন্ত্র ও তাণ্ডবের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু। ঐ ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন জাতীয় সঙ্কট থেকে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল লক্ষ লক্ষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বদেশভক্ত তরুণের আত্মদান। স্বামী প্রণবানন্দজী যে কার্য্যের সূচনা করে গেছেন, তা পরিসমাপ্ত করার মহান্ দায়িত্ব সর্ব্ব সাধারণের হলেও প্রধানত তরুণের।

॥ পাঁচ ॥

"আমি satisfied, এই দুর্দ্দিনে এত বড় সঙঘ গঠন করে তার বিশিষ্ট রূপদান কি সহজ কথা!" বাং ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে স্থূল দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙঘদেহে লীন হবার পূর্ব্বে স্বগতঃ উচ্চারণ করেছিলেন তিনি এই কথাটি। যে সঙ্কটের যুগে তাঁর আবির্ভাব সে সঙ্কট তখন করাল মূর্ত্তি নিয়ে সুপ্রকট। কিন্তু যে দুর্দ্দান্ত বেগে তিনি ছুটে চলেছিলেন আহার, নিদ্রা, বিরাম বিশ্রাম ভুলে, তাঁর রক্তমাংসের দেহ সে বেগ সহ্য করতে পারছিল না। ক্রমেই শরীর ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তজ্জন্য তিনি চিন্তিত নহেন। স্থূল, সীমাবদ্ধ শরীরে অভীষ্ট মহান্ কার্য্য আর সম্ভব নয় ভেবেই সঙঘদেহ সমাশ্রয়পূর্ব্বক বিরাটরূপে অবস্থানের সঙ্কল্প গ্রহণ। তিনি স্থূলতঃ আজ নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর বিরাট সঙঘ। তাঁর শক্তি, তাঁর মহাভাব, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর কার্য্যধারার জীবন্ত মূর্ত্তি এই সঙঘ। বস্তুতঃ সঙঘ, সঙঘনেতা ও সঙঘশক্তি তিনে এক একে তিন। তদীয় স্থূল দেহের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁর অভীষ্ট ভাব, আদর্শ ও কার্য্যধারার ব্যাপক প্রসার হয়েছে এই সঙেঘর মাধ্যমে এবং যতদিন যাবে, একাজ ততই আরো দুরন্ত ও অপ্রতিহত বেগে চলতেই থাকবে। শ্রীশ্রীআচার্য্যের সঙ্কল্পিত ও প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠনের শুভ প্রচেষ্টা যতদিন সফল না হয় ততদিন সঙেঘর বিশ্রাম বা অবসর কোথায়?

এসো ভারতের তরুণ সন্তান! স্বামী প্রণবানন্দ তোমাদের জন্যই এসেছিলেন,

যুগের কর্ত্তব্যভার বুঝিয়ে দিতে। তোমাদিগকে দলে দলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, মনুষ্যত্বের সাধনায় ও জাতির মুক্তিযজ্ঞে তোমাদিগকে ব্রতী হতে বার বার উপদেশ দিয়েছিলেন, নবদীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তোমাদিগকে শক্তিসাধনায় ও স্বধর্ম্মরক্ষায়। তিনি ছিলেন তোমাদেরই প্রকৃত হিতার্থী ও বান্ধব। তদীয় প্রদর্শিত পন্থা কি অনুসরণ করবে না তোমরা? আচার্য্যের অসমাপ্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করতে তোমরা কি আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে না? যে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়ে উত্তাল ঝঞ্ঝা-ঝটিকায় সৃষ্টি ক'রে জাতীয় জীবনে অপূরণীয় অবক্ষয় ডেকে এনেছে, সে দুষ্ট মেঘ কাটেনি, বরং তা আরো ঘোরালো হয়ে আত্মপ্রকাশে উদ্যোগী। এখনো যদি সিংহগর্জনে রুখে না দাঁড়ানো হয় তবে জানি না, এ জাতির ভাগ্যে লিখিত আছে আরো কি অশুভ পরিণতি। হয়তো সমগ্র হিন্দুজাতির অস্তিত্বই হয়ে উঠবে বিপন্ন।

না, না—তাও নয়। নৈরাশ্য দূর হোক। আছে আশার আলোক। যুগদেবতা স্বীয় ভাগবতী শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়ে গেছেন আত্মবিস্মৃত জাতির শিরায় শিরায়। এ জাতি আবার জাগবে, আবার উঠবে, আবার জগদ্‌গুরুর আসনে উপবেশনপূর্বক ভোগপ্রমত্ত ও জড়বাদে বিভ্রান্ত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে মহামুক্তির ধ্রুব পথ প্রদর্শন করবে। বাংলা তথা ভারতের তরুণদল মোহাচ্ছন্ন থাকবে না, বৈদেশিক নানা মতবাদের আবর্ত্তে পড়ে অধিককাল আর হাবুডুবু খাবে না, অচিরে তারা হবে আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ, বুঝবে তারা ভারতেরই সন্তান, ভারতের সনাতন আদর্শ ও নীতিই তাদের শাশ্বত মঙ্গলের পথে ; তারা উপলব্ধি করবে হিন্দুর মুক্তিতেই ভারতের মুক্তি, ভারতের মুক্তিতেই জগতের মুক্তি। সকল বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র ও অশুভ শক্তির কবল থেকে ভারতের প্রাণসত্তাকে রক্ষার জন্য আত্মবলিদানের সঙ্কল্প ও ব্রতই এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কর্ত্তব্য। তরুণের প্রতি স্বামী প্রণবানন্দের এই আহ্বান ও আশীর্ব্বাদ সার্থক হবে সেইদিন, যেদিন এ সঙ্কল্পের অমোঘ বীর্য্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত হবে।

।। ওঁ শ্রীশ্রীপ্রণবার্পণমস্তু।।

প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ ঃ

১। ছেলেটি কে?—কে, কার সম্বন্ধে প্রশ্নটি করেছিলেন?

২। "ছেলেটির পড়াশুনায় মন নেই"—কোন্ ছেলেটির? তাহলে তার মন কিসে?

৩। তখনকার মৈমনসিং-এর মহারাজার নাম কি? বাজিতপুর গ্রামের জমিদারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল?

৪। দেবাদিদেব মহাদেব বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থকে কি বর দিয়েছিলেন? গৃহস্থ কার শরণ নিয়েছিলেন?

৫। বিষ্ণু ভুঁইয়া শিশুর নাম কি রেখেছিলেন? বাড়ীতে শিশুটিকে কি নামে ডাকা হত? সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত নাম কি ছিল?

৬। হেমাঙ্গিনী কে ছিলেন? মায়ের নির্দেশে তিনি কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন? সেখানে তিনি কি দেখলেন?

৭। দেবীদুর্গার সামনে বসে বিনোদ কি সঙ্কল্প করেছিলেন?

৮। 'হিন্দু গো মারুম্ইতো!'—কে বলেছিলো? কেন সে বিনোদের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল?

৯। বিনোদকে কারা, কেন "ওস্তাদ" মেনে সেলাম করেছিল?

১০। "বিনোদ! তুমি নূনভাত খাও কেন?—কে বলেছিলেন? তার পরিচয় কি?

১১। হীরালাল ঘোষ কে? সে বিনোদকে কি প্রশ্ন করেছিল?

১২। শরীরের সার পদার্থের ক্ষয় কি করে হয়?

১৩। দুর গ্রামের ছেলেরা ছুটির দিনে বাজিতপুরে কেন আসত?

১৪। 'যেখান দিয়ে সে হেঁটে চলে যায় তথায় কি হয়? তাঁর সঙ্গে কথা কইলে কি পরিবর্তন হয়?

১৫। সাধুসন্ন্যাসীদের সংসার ত্যাগের উদ্দেশ্য কি?

১৬। বিনোদের সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

১৭। গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীরনাথজীর পায়ে মাথা বিকিয়েছিলেন কে?

১৮। কে, কার আদেশে ঁকাশীধামে এসেছিলেন? তিনি কোথায় সমাধিস্থ হতেন?

১৯। "ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ" কিরূপে তৈরী হয়েছিল?

২০। বিনোদের দিদির নাম কি? তিনি বুধাকে কি বলেছিলেন?

২১। গোসাপের সেবার চিত্রটির মধ্য দিয়ে বিনোদের কি পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল?

২২। কলেরা রোগে কে আক্রান্ত হয়েছিল? সে সুস্থ হয়েছিল কিভাবে?

২৩। ১৯১৯-এর আশ্বিন মাসে কি হয়েছিল?

২৪। খুলনা শহরে সেবাশ্রমটি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২৫। মহাপ্রাণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কোন্ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন? তিনি কি আশ্বাস দিয়েছিলেন?

২৬। মণি-কাঞ্চন যোগ কি করে হল? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধিনায়কত্বে কি গঠিত হয়েছিল?

২৭। সেবাকার্যে কারা, কোথা থেকে এসে যোগদান করেছিল?

২৮। 'কর্ম্মীটি গেলেন ব্রহ্মচারীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দুটি ইঙ্গিত'—ইঙ্গিত দুটি কি কি?

২৯। বাজিতপুরের কোথায় ব্রহ্মচারীর আশ্রম কুঠীর অবস্থিত?

৩০। তরুণ তাপসগণের জীবন সাধনার দুইটি ধারা কি কি?

৩১। "জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য কী" কাদের মনে এই বিচার জেগেছিল?

৩২। প্রাণের ঐকান্তিক কামনা কি?

৩৩। গান্ধী প্রবর্ত্তিত "অহিংস অসহযোগ" আন্দোলনে কি কি হয়েছিল?

৩৪। "তোমাদিগকে ত্যাগের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি হইতে হইবে।....." কে, কাদের বলেছিলেন?

৩৫। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ কিভাবে তরুণ-সন্ন্যাসীগণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

৩৬। ব্রহ্মচারী বিনোদ কিভাবে স্বামী প্রণবানন্দ হলেন?

৩৭। সন্ন্যাসীদের আদর্শ কি?

৩৮। সঙ্ঘনেতা আচার্যের প্রাণে কি সঙ্কল্প জেগেছিল?

৩৯। বৃহৎ বৃহৎ যাত্রীনিবাস কিভাবে গড়ে উঠলো?

৪০। সনাতন ধর্মের আদর্শ কি?

৪১। বিপ্লবীনেতা, আচার্যদেবের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কেন?

৪২। বিপ্লববাদীদের মনে আশঙ্কা ও আতঙ্ক জেগেছিল কেন?

৪৩। আচার্যদেবের অন্তরে দেহধারণের ইচ্ছা পুনর্জাগ্রত হল কি করে?
৪৪। সঙ্ঘনেতা কোন্ স্থানে দুর্গাপূজার সঙ্কল্প করেছিলেন?
৪৫। বেদান্তের বাণী ও সাধনা পাশ্চাত্য দেশে কে প্রচার করেছিলেন?
৪৬। ভারতবাসীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা লক্ষ করে স্বামীজি কি বলেছিলেন?
৪৭। আচার্য্যদেব কাশীধামে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন কেন?
৪৮। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কারা, কার নির্দেশে কাশীধামে সমবেত হয়েছিলেন?
৪৯। কাশীধামে ধর্মের নবজাগরণ অনুভূত হয়েছিল কেন?
৫০। শক্তির জায়গান কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?
৫১। আচার্য্যদেব কোন্ মালায় জপ করেছেন?
৫২। আচার্য্যদেবের মূল লক্ষ্য কি ছিল?
৫৩। 'স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবনে মূৰ্ত্ত'—কি?
৫৪। কোন সঙ্কল্পে আচার্য্যদেবের আবির্ভাব?
৫৫। ভারতের সমস্যা কি ছিল?
৫৬। আচার্য্যদেব গ্রামবাসীদের কি প্রশ্ন করেছিলেন?
৫৭। আচার্য্যদেব কি উপলব্ধি করেছিলেন?
৫৮। ১৯৪০ সালে হিন্দু-সম্মেলনে কে সভাপতি ছিলেন?
৫৯। ভারত সেবাশ্রম সঙঘ কিসের জীবন্ত মূর্ত্তি?
৬০। তরুণদের প্রকৃত হিতার্থী ও বান্ধব কে ছিলেন?
৬১। এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র কর্তব্য কি?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। বিনোদের চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা কর।
২। বাড়ীতে বিনোদ কিভাবে থাকতেন বিস্তৃতভাবে লেখ।
৩। সারদা দেবী সানন্দে স্বামীকে কি আশ্চর্য্য কাহিনী জানিয়েছিলেন?
৪। শিশু দেবতার আগমনকাল বর্ণনা কর।
৫। সন্ন্যাসজীবনে বিনোদের নাম কি? নিত্যপাঠ্য গুরু প্রণাম মন্ত্রটি উল্লেখ কর।
৬। একটি ঘটনার উল্লেখ করে বিনোদের অদম্য সঙ্কল্পের কথা বুঝিয়ে লেখ।
৭। বিনোদের দৈহিক শক্তি প্রমাণের দুইটি ঘটনা লেখ।

৮। ইন্দ্রিয় সংযত, শান্ত করতে কি কি করতে হবে?

৯। আচার্য শঙ্করের উপদেশ কি?

১০। সংযম-সাধনা কিরূপ?

১১। পরবর্তীকালে আচার্য বিনোদ ভোলা সম্বন্ধে কি বলেছিলেন?

১২। নাথজীর নির্দেশে বিনোদ কোথায় ফিরেছিলেন? সেখানে সমস্ত দিন ও রাত্রি কি করতেন?

১৩। জঙ্গলের যে স্থানে শিক্ষা দীক্ষার আয়োজন হয়েছিল তার বর্ণনা লেখ।

১৪। কোন তিথিতে মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল? কিভাবে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

১৫। দেবাদিদেব মহাদেবের আত্মপ্রকাশ ঘটল কি রূপে?

১৬। বিনোদের জীব-দুঃখ বিগলিত প্রাণের পরিচয় দেওয়ার জন্য দুটি ঘটনার উল্লেখ কর।

১৭। ব্রহ্মচারী দৃঢ় কণ্ঠে সঙ্গিগণকে কি বলেছিলেন?

১৮। স্বামী বিবেকানন্দ এবং ব্রহ্মচারী বিনোদের আদর্শ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৯। ব্রহ্মচারী বিনোদ চিহ্নিত সন্তানদের অন্যতমকে কি বলে উপদেশ দিয়েছিলেন?

২০। চিহ্নিত কর্ম্মীগণের মনে ব্রহ্মচারী বিনোদের মহত্ব সম্বন্ধে ক্রমাগত উচ্চতর হয়েছিল কেন?

২১। তরুণদল যে পাঁচটি প্রতিজ্ঞা করেছিল সেইগুলি উল্লেখ কর।

২২। ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠে মাঘীপূর্ণিমার মহোৎসবের বর্ণনা দাও।

২৩। কারা, কি কারণে "আনন্দমঠের" সংশপ্তক সন্তানদল বলে অনুভব করল?

২৪। ব্রহ্মচর্য সাধনার মহাবাণীর সারাংশ লেখ।

২৫। ১৯১৭ এর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঘীপূর্ণিমা উল্লেখযোগ্য কেন?

২৬। কি কথার পর আচার্যের নেতৃত্বের উপর সন্তানদের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরতা দৃঢ়মূল হল?

২৭। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কি হয়েছিল?

২৮। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গয়াধামে কি ঘটেছিল? ঐ ঘটনার পরবর্ত্তী কাহিনী লেখ।

২৯। আচার্য দেবের কিরূপ ব্যবস্থায় স্বল্পব্যয়ে তীর্থকৃত্য করার সুযোগ হয়?

৩০। তীর্থের অতীত মহিমা পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিভাবে?

৩১। গুরুপূজা, গুরুভক্তি ও গুরু সেবার আন্দোলনের প্রভাবে কি পরিবর্তন হবে বলে আচার্যদেবের বিশ্বাস ছিল?

৩২। বাংলার তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘনেতা উৎসাহের কি বাণী ঘোষণা করেছিলেন?

৩৩। দুর্গাপূজার মধ্য দিয়ে আচার্যদেব কি কি পুনঃপ্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন?

৩৪। সঙ্ঘনেতা তপঃসিদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে কি দেখেছিলেন?

৩৫। দেবীদুর্গার প্রসন্নতার জন্য আচার্য্যদেব যা শিখিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন— তার সারমর্ম লেখ।

৩৬। হিন্দু সমাজের ভয়ের কারণ কি? কালীপূজার উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩৭। "ত্রিঅবতার শক্তি ও ভাব যেন সঙ্ঘনেতার আদর্শ, চরিত্র ও কর্মধারায় মূর্ত্ত"— ব্যাখ্যা কর।

৩৮। সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদে আচার্য্যদেবের সুস্পষ্ট অভিমত কি ছিল?

৩৯। আচার্য্যদেব হিন্দুদের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন?

৪০। হিন্দু মিলন-মন্দির আন্দোলন কি? তার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মধারা কি?

৪১। রক্ষিদলের মূলমন্ত্র কি? তাদের কিরূপ তৈরী হতে হবে?

৪২। "মহারাজ, আমাদের বাঁচান...."—শুনে আচার্যদেব কি ব্যবস্থা করেন? দুর্বৃত্তদল কোথায় কোথায় অত্যাচার করেছিল?

৪৩। শিখ সম্প্রদায়ের খাল্‌সা বাহিনী গঠনের সূত্রপাত হয়েছিল কিভাবে?

৪৪। 'রক্ষী' শব্দটির ব্যাপক অর্থ ব্যাখ্যা কর। বিশেষ অর্থে 'রক্ষী' বলতে কাদের বোঝান হয়েছে?